পাক্ষিক

আহমদী

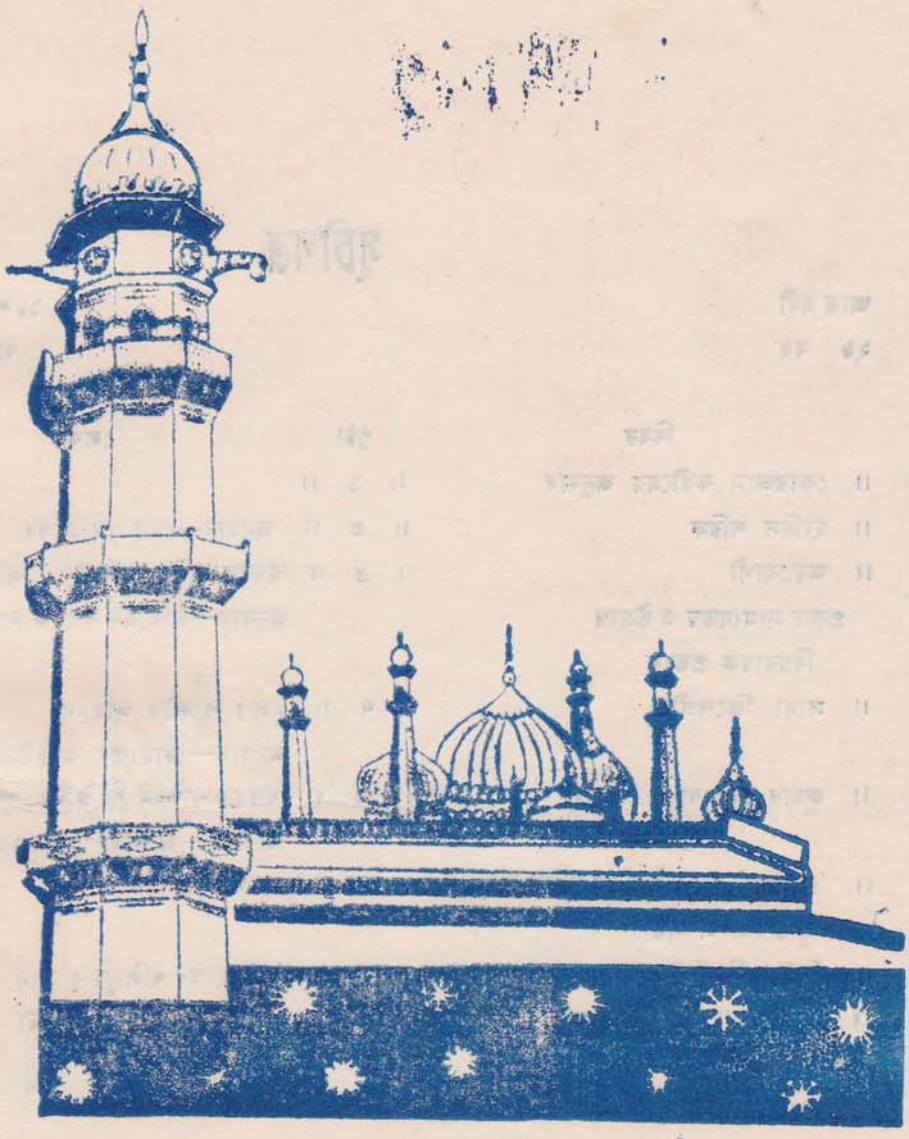

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায় : ২৬শ বর্ষ : ১৮শ ১৯শ ও ২০শ সংখ্যা

১৬ ই ফাল্গুন, ১৩৭৯ বাংলা : ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ ইং : ২৮ শে তবলীগ, ১৩৫২ হিজরী শামসী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত ৮'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ ১৪ শিলিং

সূচীপত্র

আহ্‌মদী
২৬ বর্ষ

১৮শ, ১৯শ ও ২০শ সংখ্যা
২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ ১ ॥	
॥ হাদিস শরিফ	॥ ৩ ॥	অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মদ
॥ অমৃতবাণী	॥ ৪ ॥	হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)
প্রকৃত নামাযতত্ত্ব ও উহার বিশ্বব্যাপক প্রভাব		অনুবাদ—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
॥ সাদা জিন্দেগী	॥ ৭ ॥	মূলঃ শাকীর আহমদ অনুবাদ—মোহাম্মদ মতিউর রহমান
॥ জুমার খোৎবা	॥ ১২ ॥	হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ) অনুবাদ—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
॥ 'ওসিয়ত' : অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ	॥ ১৬ ॥	শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান
মুক্তির সরল পথ		
॥ বিশ্ব-শান্তি কি সম্ভব ?	॥ ২০ ॥	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান
॥ বাংলা-ভাষায় আরবীর প্রভাব	॥ ২৩ ॥	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
॥ সংবাদ		
ময়মনসিংহ জমাতের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন		
॥ বিশেষ ঘোষণা		
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসা		

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় ঃ ২৬শ বর্ষ ঃ ১৮শ, ১৯শ ও ২০শসংখ্যা ঃ
১৬ ই ফাল্গুন, ১৩৭৯ বাং ঃ ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ ইং ঃ ২৮ শে তবলীগ, ১৩৫২ হিজরী শামসী

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

॥ সুরা কাহ্‌ফ ॥

১০ম রুকু

৭২। অতঃপর তাহারা উভয়ে যাত্রা (আরম্ভ) করিল (এবং) চলিতে চলিতে তাহারা যখন এক নৌকায় আরোহন করিল, তখন (সেই বুযুর্গ) উহাতে এক ছিদ্র করিয়া দিল, তখন মুসা বলিল, আপনি কি উহার আরোহীগণকে ডুবাইবার উদ্দেশ্যে উহাকে ছিদ্র করিয়াছিলেন? আপনি নিশ্চয় নিন্দনীয় কাজ করিয়াছেন।

৭৩। (সেই বুযুর্গ) বলিল আমি কি (পূর্বে বলি নাই যে, তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া চলিতে পারিবে না?

৭৪। (তখন) মুসা বলিল, আপনি আমাকে (এ বার) ধরিবেন না (কারণ) আমি (আপনার হেদায়েত) ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং এজন্য আপনি আমার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না।

৭৫। অতঃপর তাহারা (সেখান হইতে) অগ্রসর হইল (এবং) চলিতে চলিতে তাহারা যখন এক বালকের সাক্ষাৎ পাইল, তখন (সেই বুযুর্গ) তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল, ইহাতে মুসা বলিল, কি (আশ্চর্য!) আপনি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে (তাহার) কোন ব্যক্তিকে (হত্যা করার অপরাধ) ছাড়াই অন্যায় ভাবে হত্যা করিয়া ফেলিলেন; নিশ্চয় আপনি এক অতি মন্দ কাজ করিয়াছেন।

৭৬। (সেই বুযুর্গ) বলিল, আমি কি (পূর্বে) বলি নাই যে, তুমি আমার সঙ্গে কখনও ধৈর্য ধারণ করিয়া চলিতে পারিবেনা।

৭৭। মুসা বলিল, আমি যদি ইহার পর আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তাহা হইলে আপনি আর আমাকে সঙ্গে রাখিবেন না, (কারণ তখন) ন্যায়সঙ্গত-ভাবে আপনার নিকট আমার কোন ওজর আপত্তি থাকিবে না।

৭৮। অতঃপর তাহারা (সেখান হইতে) সম্মুখে অগ্রসর হইল। অবশেষে তাহারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল (এবং) তাহাদের কাছে (তাহারা) কিছু খাবার চাহিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের আতিথেয়তা করিতে অস্বীকার করিল। তারপর সেই গ্রামে তাহারা এক পতনুন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইল, সেই (বুযুর্গ) ব্যক্তি উহা (মেরামত করিয়া) খাড়া করিয়া দিল, মুসা বলিল, আপনি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহার কিছু না কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।

৭৯। সেই (বুযুর্গ) ব্যক্তি বলিল, এখন হইতে আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ। যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই আমি এখন তোমাকে উহার তাৎপর্য বলিয়া দিতেছি।

৮০। সেই যে নৌকাটি ছিল উহা আসলে কয়েকজন নিঃসহায় দরিদ্রের (সম্পত্তি) ছিল, যাহারা সমুদ্রে কাজকর্ম করিত; আমি উহাকে এই জন্য দোষযুক্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলাম যে, তাহাদের সম্মুখে (সমুদ্রের ওপারে) এক (জালেম) বাদশাহ্ ছিল, যে নৌকা বলপূর্বক কাড়িয়া লইতেছিল।

৮১। এবং বালকের বিষয় এই যে তাহার পিতামাতা উভয়ে ঈমানদার ছিল সুতরাং (তাহার অবস্থা দেখিয়া) আমরা আশংকা করিলাম যে, সে (বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া) বিদ্রোহাচরন ও অবাধ্যতা দ্বারা তাহাদিকে যন্ত্রনা দিবে।

৮২। অতএব আমরা ইচ্ছা করিলাম যে তাহাদের রব তাহার পরিবর্তে এমন এক (পুত্র) দান করুন, যে তাহার চেয়ে পবিত্রতায় (পিতামাতার) নিকটতর হয়।

৮৩। আর বাকী সেই প্রাচীরের কথা উহা সেই নগরের দুই এতীম বালকের সম্পত্তি ছিল এবং উহার নীচে তাহাদের জন্য (প্রোথিত) ধন ছিল এবং তাহাদের পিতা এক সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি ছিল। সুতরাং তোমার রব ইচ্ছা করিলেন যে বালক দুইটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের ধনাগার বাহির করিয়া লউক; (ইহা) তোমার রবের পক্ষ হইতে (তাহাদের উপর) বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ, বস্তুতঃ আমি (এইরূপ কাজ) নিজের ইচ্ছায় করি নাই। ইহা সেই সকল বিষয়ের আসল তত্ত্ব, যেগুলির সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই।

হাদিস শরীফ

নামায

(১)

আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, আমাকে বল যদি তোমাদের কাহারও দ্বারদেশ দিয়া নদী প্রবাহমান থাকে এবং উহাতে সে পাঁচবার গোসল করে, তাহা হইলে কি তাহার (অঙ্গে) কোন ময়লা থাকিবে ? তাঁহারা (সাহাবারা) বলিলেন, না, তাহার (অঙ্গে) কিছুমাত্র ময়লা থাকিবে না। তিনি বলিলেন, ইহাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত। উহার দ্বারা আল্লাহ্ তাহার সকল পাপ মোচন করিয়া দেন। (বুখারী ও মুস্লিম)

(২)

বুরাইদা হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, তাহাদের (মুসলমানদের) ও আমাদের (আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের) মধ্যে চুক্তি নামাযের। যে কেহ ইহাকে পরিত্যাগ করে সে নিশ্চয় কাফের।

(আহমদ, তিরমিযি, নেসাঙ্গ ও ইবনে মাজা)

(৩)

আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, মুনাফেকের নিকট এশা এবং ফজর ব্যতিরেকে অন্য কোনো সময়ের নামায অধিকতর কষ্টকর নহে। তাহারা যদি জানিত যে ইহার মধ্যে কি (কল্যাণ) আছে, তাহা হইলে তাহারা বুকের উপর হামাগুড়ি দিয়া উহাতে যোগ দিত।

(বুখারী ও মুসলিম)।

(৪)

ওসমান হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন, যে কেহ বা-জামাত এশার নামায পড়ে (তাহার পুণ্য এরূপ যে) সে যেন অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত (নামাযে) খাড়া থাকে এবং যে কেহ ফজরের নামায বা-জামাত পড়ে, সে যেন বাকি অর্ধেক রাত্রি (নামাযে) খাড়া থাকে। (মুসলিম)

(৫)

আলি হইতে বর্ণিত হইয়াছে আল্লাহ্‌র রসুল খন্দকের যুদ্ধের দিন বলিয়াছিলেন, তাহারা (কাফেরগণ) আমাদিগকে মধ্যবর্তী নামায অর্থাৎ আসরের নামায পড়া হইতে (যুদ্ধে লিপ্ত রাখার কারণে) বিরত রাখিয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদের গৃহ ও কবরকে অগ্নিপূর্ণ করুন।

(বুখারী ও মুসলিম)।

(৭)

আবু যার হইতে বর্ণিত হইয়াছে আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন, মুসলমান দাস, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের আশা লইয়া নামায পড়ে নিশ্চয় এই বৃক্ষ হইতে (সম্মুখের এক বৃক্ষের দিকে দেখাইয়া) এই পাতা ঝরিয়া পড়ার ন্যায়, তাহার পাপ সমূহ খসিয়া পড়ে।

(আহমদ)।

(৭)

ইবনে মসউদ ও সামোয়ার বিন জান্দেব হইতে বর্ণিত হইয়াছে ; আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন, আসরের নামায হইল মধ্যবর্তী নামায। (তিরমিযি)।

যায়েদ বিন সাবেত এবং আয়েশা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যোহরের নামায হইল মধ্যবর্তী নামায।

(৮)

আনাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে : আল্লাহ্‌র রসুল, বলিয়াছেন সুগন্ধিদ্রব্য এবং স্ত্রীগণকে আমার নিকট প্রিয় করা হইয়াছে এবং আমার চক্ষের স্নিগ্ধতা নামাযে করা হইয়াছে। (আহমদ, নেসাঈ)।

অনুবাদ—মৌঃ মোহম্মদ

হযরত মসিহ মাউদ (সাঃ)-এর

অমৃত বানী

প্রকৃত নামায তত্ত্ব এবং উহার বিপ্লবাত্তক প্রভাব

দ্বিতীয় বিষয় (তৌহিদের পর) হইল—নামায, যাহার নিয়মিত পাবন্দীর জন্য কোরআন শরীফে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গেই ইহাও স্বরণ রাখিবে যে, কোরআন মজীদে সেই মুসল্লীগণের উপর অভিসম্পাত করা হইয়াছে, যাহারা নামাজের তত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অবহেলাকারী এবং নিজেদের ভাইদিগের প্রতি অনুদার। প্রকৃত কথা এই যে, নামায আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে একটি আকুল আবেদন —আল্লাহ্তায়ালা যেন সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা ও দুস্কর্ম হইতে রক্ষা করেন; মানুষ (আল্লাহ্তায়ালা হইতে) বিচ্ছেদ ও বিরহ বেদনায় সিক্ত, তাহার বাসনা, আল্লাহ্তায়ালার সান্নিধ্য যেন প্রাপ্ত হয়, যাহাতে সে নাজাত প্রসূত প্রশান্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু ইহা লাভ করা তাহার কোন চালাকী, কৌশল বা নিজস্ব গুণ দ্বারা সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং নিজ সন্নিধানে আসার) আহ্বান না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে (তাঁহার সান্নিধ্যে) যাইতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পবিত্র না করেন, সে পবিত্র হইতে পারে না। অনেক লোকই এ বিষয়ের সাক্ষ্য বহন করেন যে, নিজেরা প্রলিপ্ত কোন পাপ সম্বন্ধে তাহাদের মন বার বার অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, উহা যেন দূরিভূত ও নির্মূল হইয়া যায় কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও উহা দূর হয় না, অথচ তাহাদের বিবেকও তাহাদের দংশন ও নিন্দা করিতে থাকে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পদস্খলণ ঘটে। এতদ্বারা বুঝা গেল যে, পাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র করা একমাত্র আল্লাহ্তায়ালারই কার্য। নিজ শক্তিতেই কেহ মুক্ত ও পবিত্র হইতে পারে না। তবে ইহা সত্য যে, উহার জন্য সাধনা ও চেষ্টা আবশ্যকীয়। মোট কথা, সেই অন্তকরণ যাহা পাপে পরিপূর্ণ এবং খোদাতায়ালার তত্ত্বজ্ঞান ও নৈকট্য হইতে দূরে পড়িয়া আছে, উহাকে পবিত্র করার এবং দূর হইতে নিকটে আনার জন্যই নামায। ইহা দ্বারা পাপের দূরিকরণ হয়- অশুভ মনোবৃত্তগুলির স্থলে শুভ ও পবিত্র মনোবৃত্তি সমূহ দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করা হয়। এই গুঢ় তত্ত্বই (কোরআনের আয়াতে) বলা হইয়াছে যে, "নামায সর্বপ্রকার পাপকে দূর করে বা নামায "ফাহ্শা' (ব্যক্তিগত ত্রুটি) ও 'মুনকার' (সমাজগত দোষনীয় বিষয়) হইতে বিরত করে"।

তবে, নামায কি? নামায এক দোওয়া (বা প্রর্থনা) যাহা অন্তর বেদনা ও দগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়। এজন্যই ইহার নাম 'সালাত' (صلوٰة অর্থাৎ বিদগ্ধ

হওয়া)। কেননা ইহাতে (আল্লাহর জন্য) বিচ্ছেদ উত্তেজনা, প্রাণের জ্বালা ও মর্মবেদনায় ভরা নিবেদন পেশ করা হয়—যেন আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি অন্তর হইতে দূর করেন এবং উহাদের স্থলে আপন পবিত্র প্রেম ও ভালবাসা স্বীয় অনুগ্রহে সৃষ্টি করিয়া দেন। 'সালাত' صلوٰة শব্দটিই ইহার নির্দেশ করিতেছে যে, শুধু বাক্য উচ্চারণ ও প্রার্থনাই যথেষ্ট নয়, বরং উহার সহিত উদ্বেগ উত্তাপ, ক্রন্দন উচ্ছাস এবং অন্তর বেদনা সংযুক্ত হওয়া আবশ্যকীয়। খোদাতা'লা কোন দোয়া শ্রবন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রার্থনাকারী মৃত্যুর কাছা কাছি নিজেকে পৌঁছাইয়া দেয়। দোয়া চাওয়া একটি কঠিন ব্যাপার। মানুষ ইহার তত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ। অনেকে আমাকে চিঠি লিখেন যে, অমুক সময়ে তাহারা অমুক দোয়া করিয়াছিলেন কিন্তু ফল পান নাই। এবং এই প্রকারে তাহারা খোদাতায়ালার প্রতি কুধারণা পোষণ করেন এবং অবশেষে নিরাশ হইয়া তাহাদের ধ্বংস (বা আধ্যাত্মিক মৃত্যু) ঘটিয়া যায়। তাহারা জানে না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না দোয়ার অপরিহার্য শর্ত্তাবলী পূর্ণ হয় সেই দোয়ার কোন উপকার হয় না। দোওয়ার অপরিহার্য শর্ত্তাবলীর মধ্যে ইহা একটি যে, অন্তর যেন বিগলিত হয় এবং আত্মা পানির মত একমেবাদ্বীতিয়ম খোদার আস্তানায় পতিত হয় এবং এক উদ্বেগ ও উত্তেজনার উহাতে সৃষ্টি হয়। এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ যেন বেসবর ও অধৈর্য্য না হয় বরং ধর্য ও স্থর্য্যের সহিত দোয়ায় স্থির থাকে। তবে কিনা আশা করা যায় যে সেই দোয়া কবুল হইবে।

নামায অতি উচ্চ পর্যায়ের দোয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ উহার কদর ও মর্যাদা বুঝে নাই। উহার তাৎপর্য শুধু এতটুকুই মনে করে যে, আনুষ্ঠানিক (রসম ও রেওয়াজ) রূপে 'কেয়াম', 'রুকু' ও 'সেজদা' করা এবং কতক বাক্য, উহ দের অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক, তোতা পাখীর মত মুখস্ত উচ্চারন করা।.....

আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) যখন কোন কষ্ট বা বিপদ দেখিতেন, সঙ্গে সঙ্গে নামাযে দাঁড়াইয়া পড়িতেন এবং আমার নিজের এবং পূর্ববর্ত্তী সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষ সকলের অভিজ্ঞতা এই যে, আল্লাহ্র দিকে লইয়া যাওয়ার জন্য নামাজ হইতে অধিকতর কার্যকরী আকর্ষণ-কারী বস্তু) আর কিছু নাই। যখন মানুষ 'কেয়াম' করে তখন সে তদ্বারা এক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পন্থা অবলম্বন করে। এক দাস যখন তাহার প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তখন সে সর্বদা হাত বাঁধিয়া দাঁড়ায়। তেমনিভাবে 'রুকু'-ও ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ভঙ্গি, যাহা 'কেয়াম' হইতে অধিকতর শ্রদ্ধা-জ্ঞাপক এবং 'সেজদা' আদব ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অন্যতম পর্য্যায়। যখন মানুষ নিজেকে 'ফানা' বা আত্ম-বিলিনতার অবস্থায় ফেলিয়া দেয়, তখন সে সেজদায় পতিত হয়। আফসোস সেই নির্বোধ ও সংসার উপাসকগণের উপর, যাহারা নামাযের মধ্যে রদ বদল করিতে ইচ্ছুক এবং রুকু ও সেজদার উপর তাহারা অভিযোগ করে। ইহাতো চরম পর্য্যায়ের প্রশংসার বিষয়। প্রকৃত কথা এই যে, যে উর্দ্ধলোক হইতে নামায আসিয়াছে, তথা হইতে যে পর্যন্ত না মানুষ কোন অংশ লাভ করিয়া থাকে, সে পর্যন্ত মানুষ শূন্যহস্ত। যে ব্যক্তির আল্লাহতায়ালার উপরে 'একীন' বা দৃঢ় বিশ্বাস নাই, সে নামাজে কি করিয়া বিশ্বসে স্থাপন করিতে পারে?

নামায এমনই একটি বিষয়, যাহা সামগ্রিক কল্যাণের আঁকর এবং সর্বপ্রকার অকল্যান প্রতিরোধকারী।.....

আমি পূর্বে কেয়াম ও রুকু এবং সেজদা সম্বন্ধে

যাহা বর্ণনা করিয়াছি যে ইহাদের মাধ্যমে মানবের বিনয় সুলভ অবস্থার চিত্র দেখান হইয়াছে—প্রথমে মানুষ কেয়াম করে, যখন ইহা হইতে আরও উন্নতি করে, তখন রুকু করে, আর যখন একেবারে ফানা (আত্মবিলিন) হইয়া যায়, তখন সেজদায় পতিত হয় —আমি যাহা বলিয়াছি তাহা শুধু গতানুগতিক ও আনুষ্ঠানিক ভাবে বলি নাই বরং স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি; বরং যে কোন ব্যক্তি নামায ঐ ভাবে পড়িয়া এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লউক। হতভাগা সেই ব্যক্তি যে এই ব্যবস্থা পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখে না এবং ইহা দ্বারা উপকার লাভ করার চেষ্টা করে না। এই ব্যবস্থা পত্রটি সর্বদা স্মরণ রাখ এবং এতদ্বারা উপকার লাভ কর। যখনই দুঃখ বা বিপদের সম্মুখীন হও, তখনই সঙ্গে সঙ্গে নামাযে দণ্ডায়মান হইয়া যাও এবং দুঃখ কষ্ট ও বিপদ খোলাখোলিভাবে আল্লাহ তায়ালার সমীপে পেশ কর, কেননা নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আছেন এবং একমাত্র তিনিই, যিনি প্রত্যেক প্রকার বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ আপদ হইতে মানুষকে উদ্ধার করেন। বিপদে যে তাঁহাকে ডাকে তাহার ডাকে তিনি সাড়া দিয়া থাকেন। তিনি ছাড়া কেহ নাই যে সাহায্য কারী হইতে পারে। নিতান্তই নির্বোধ ও ত্রুটিপূর্ণ সেই ব্যক্তিগন যাহারা বিপদ আপদ আসিলে উকিল, কিংবা ডাক্তার অথবা অন্যান্য লক্ষের দিকে তো ছুটিয়া যায় কিন্তু খোদাতায়ালার পানে ধাবিত হয় না এবং তাঁহার গৃহ খালি ছাড়িয়া দেয়। মোমেন তো সেই ব্যক্তি যে সর্ব প্রথম আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হয়।.....

এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোনিবেশ না কর এবং তাহার পানে ধাবিত না হও, তাহা হইলে তাঁহার পবিত্র সত্তায় কোন ত্রুটি ঘটিতে পারে না এবং তিনিও তোমাদের কোন কিছুই পারোওয়া রাখেন না। যথা তিনি নিজে বলেন ঃ—

قل ما يعبؤ بكم ربى لولا دعاء كم

অর্থাৎ তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আমার রব তোমাদের ব্যাপারে কী পারোয়া রাখেন যদি না তোমরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত তাঁহার এবাদত কর? যেমন তিনি করুণাকর ও পরম দয়ালু, তেমনি তিনি গণী ও বেনেয়ায (পরমুখপেক্ষীতাহীন)"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮-১১৩)

অনুবাদ ঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মদ

● ● ● ● ●

"এবং আল্লাহ দৃষ্টান্ত দেন এক শহরের যাহা নিরাপত্তা ও শান্তি উপভোগ করিতেছিল, উহার উপজীবিকা উহার নিকট আসিত প্রচুর পরিমানে সকল স্থান হইতে, কিন্তু উহা আল্লাহ্‌র নেয়ামতর অকৃতজ্ঞতা করিল, ফলে খোদা উহাকে ক্ষুধা ও ভীতির পোষাকের মজা গ্রহণ করাইল, যেহেতু তাহারা কলা কৌশলের কাজ করিয়াছিল " (আল-কুরআন); ১৬ ঃ ১১৩)।

সাদা জেন্দেগী

মূল ঃ শাব্বীর আহমদ

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাইহোক, খাদ্য দ্রব্যে অনাড়ম্বরতা অবম্বন করলে জীবিকার নিশ্চয়তা লাভ করার সাথে সাথে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিরও সুযোগ পাওয়া যায়। আমীর এবং গরীবের মধ্যে যে আকাশ চুম্বী ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তারও নিরসন হতে পারে।

এই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করতে গিয়ে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে তার সমাধান কল্পে হুজুর আকদাস (রাঃ) বিভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন। সে গুলো মোটা মুটি নিম্নরূপ ঃ—

"যে সমস্ত এলাকায় স্বাদ এবং হজমের জন্যে ভাত এবং তরকারীর সাথে পাতলা ডাল, আচার, চাটনি, ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলন আছে। তাদের ওগুলো ব্যবহারে অনুমতি দেয়া হ'য়েছে। নাস্তার সাথে চা এর ব্যবহার একটা বিশেষ দিক এবং খাবারের মধ্যে ইহাকে শামেল করা যায় না। এই জন্যে ইহার সাথে কোন এক প্রকারের খাবার ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হ'য়েছে। কাহারও খাবারের সাথে মিষ্টি খাবার অভ্যাস আছে। তারা এক তরকারী বাদে কোন এক প্রকারের মিষ্টি দ্রব্য খাবহার করতে পারেন। দুধ এবং ফল শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিষ। এজন্যে ঐ গুলোকে খাবারের মধ্যে শামেল করা যাবে না। কৃষকদের খাবারের সাথে মূলা, গাজর খাওয়ার রেওয়াজ আছে। তাদের ওগুলো খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। রোগীর জন্যে কোন প্রকার বাধ্যকতা থাকবেনা। মেহমানের জন্যে একের অধিক খাবারের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। কিন্তু এক তরকারী পরিবেশন করাই অধিক পছন্দনীয়। সম্মানিত এবং বৃদ্ধ দেখে একের অধিক খাদ্য পরিবেশন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদি মেহমান দীর্ঘ স্থায়ী হয় তবে এক খাদ্য পরিবেশন করার চেষ্টা করা উচিৎ। কেননা আঁ হজরত (সাঃ) বলেছেন ঃ আতিথেয়তামাত্র তিন দিনের জন্যে।"

(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রতিদিন চর্ব, চোষ্য, লেহ্য পেয়ে প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য তৈরী করতে গিয়ে অনেক বাংগালী গৃহিনীকে অধিকাংশ সময় পাকের ঘরে আটকে থাকতে হয়। যার ফলে তাদের শরীরে নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হ'য়ে অকালে মারা যায়, এমনকি সময়াভাবে ইবাদত বন্দেগীতেও তারা ভালভাবে মননিবেশ করতে পারে না। তাই এক খাদ্যের অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারলে যেমন বহু বাঙ্গালী গৃহিনীকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে তেমনি তারা ইবাদত বন্দেগীর প্রতিও সমানভাবে মননিবেশ করতে পারেন—

অনুবাদক)

দুই ঈদের ব্যতিক্রম—দুই ঈদকে এই উসুলের বাইরে রাখা জরুরী ছিল। তাই হজরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেছেন ঃ-

"নিঃসন্দেহে এক খাদ্য গ্রহণ করা উচিৎ। ইহার

বেশী খাওয়ারও অনুমতি আছে। অবস্থা বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম করা যায়। যেমন রসুল করিম (সাঃ) এর শিক্ষা থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে, আল্লাহর ইচ্ছায় এক খানাই তার জন্যে যথেষ্ট ছিল। বিশেষ দাওয়াতে অথবা দুই ঈদের দিনে তিনি একাধিক খাদ্য গ্রহণ করতেন। তাই আমিও দুই ঈদকে এই বাধ্য বাধকতা থেকে রেহাই দিয়েছি। কেননা যখন রসুল করীম (সাঃ) এর সামনে এই প্রশ্ন পেশ হয়েছিল তখন তিনি দুই ঈদ সম্বন্ধে বলেছিলেন আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্যে খানা পিনার দিন করেছেন। তাই আমি সাধারণ খাদ্য সম্বন্ধে যে হেদায়াত দিয়েছিলাম এর মধ্যে এটাও নির্ধারিত করেছিলাম যে, দুই ঈদের দিনে একের অধিক খাদ্য খাওয়া যাবে। তবে লোকদের উচিৎ তাদের নিজস্ব বুদ্ধি খাটিয়ে লক্ষ্য রাখবে যেন এতেও অড়ম্বরীতার সীমা না ছাড়িয়ে যায়। কেননা যখন নীতিগতভাবে সাদা সিদা জীবনকে গ্রহণ করা হ'য়েছে তখন ইহার কার্যকারিতার জন্যে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।"

হুজুর (রাঃ) এর উল্লিখিত বয়ান থেকে দুই ঈদের ব্যতিক্রম সম্বন্ধে বলা হল। কয়েক বন্ধুর অনুরোধে জুময়াকেও ইহার মধ্যে শামেল করা হয়েছে।

"অতপর এ ব্যাপারে যেখানে সাদা সিদা জীবন যাপনের জন্যে তাকিদ দিতেছি সেখানে কয়েক বন্ধুর বার বার অনুরোধে আরও দুইটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করছি। ঐ দিন একের অধিক খাদ্য গ্রহণ করার জন্য অনুমতি দেয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই পর্যন্ত যে যদি ঐ দিন একের অধিক খাদ্য গ্রহণ করে তবে তা সিদ্ধ হবে। ইহা নয় যে ঐ দিন একের অধিক খাদ্য পাক করতেই হবে। এবং ঐ ব্যতিক্রমের অনুমতি থেকে ফায়দা নিতে গিয়ে কয়েক প্রকারের খাদ্যই পাকাতে লেগে যেতে হবে। জুমার দিনের জন্যে ব্যতিক্রম করা গেল এবং ঐ দিন দুইটি খাদ্য পাক করার অনুমতি দেয়া হল। কেননা জুমার দিনের ব্যাপারে রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন,

"ইহা আমাদের ঈদ"।—[খোতবা জুময়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ সন]

মোদ্দা কথা এই যে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে নানা প্রকার অসুবিধা থাকা সত্তেও সাধারণ পন্থা অবলম্বন করার তাগিদই হুজুর (রাঃ) দিয়েছেন। তবে দুই ঈদে, জুমার দিনে, মেহমান দারীতে এবং অন্যান্য খুশীর দিনগুলিতে কিছু ব্যতিক্রম করা যাবে। অন্যান্য দিনগুলি শুধু এক তরকারী খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে যা পুরোপুরি আমল করলে আমরা আনায়াসেই খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে সক্ষম হব।

পোষাক পরিচ্ছদে আড়ম্বরহীনতা

পোষাক পরিচ্ছদে আড়ম্বরহীনতা অবলম্বন করাও কম দৃষ্টি দেয়ার বিষয় নয়। আমাদের দেশে কাপড় চোপড়ের দারুন অভাব। প্রতি বৎসর বহু বৈদেশিক মুদ্রা এই কাপড় চোপড় আমদানী করতে খরচ হয় তাছাড়া নূতন নূতন বিজাতীয় ফ্যাশনও দিন দিন দেশের সর্বত্র অভিশাপের মত ছড়িয়ে পড়ছে। যার ফলে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি লুপ্ত হ'তে বসেছে। সুতরাং এ ভাবে দেশের সম্পদ নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে জাতীয় চরিত্র বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। আমরা এহেন প্রভাব থেকে না শুধু দেশের আর্থিক অবস্থাই মজবুত করতে সক্ষম হ'তে পারি বরং জাতীয় ঐতিহ্যকেও হেফাজত করতে পারি। সুতরাং দেশের ব্যবসা বানিজ্যের উন্নতির প্রতি দৃষ্টির সাথে সাথে যদি কাপড় চোপড়ের ব্যাপারে অনাড়ম্বর জীবন যাপনের চেষ্টা চালানো যায় তবে আশা-

প্রদ ফল লাভ করার উজ্জল সম্ভাবনা আছে।

হজরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাহরীক-এ জাদীদের ঘোষনাতেই এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

"পোষাক পরিচ্ছদে আড়ম্বরহীনতা খুবই প্রয়োজনীয় দিক, আমি দেখেছি পোষাক পরিচ্ছদে আড়ম্বরহীনতা না থাকায় আমীর এবং গরীবের মধ্যে গগনচুম্বী প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ধনী সব সময় তার কাপড় সামলিয়ে রাখে এবং সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে যেন তার কাপড়ে কোন দাগ না লাগে বা ময়লা না হয়। এইজন্যে সে সর্বদা গরীব থেকে তফাতে থাকে। কাপড় চোপড়ে আড়ম্বরহীনতার বিশেষ প্রয়োজন এবং আমি ত বলব যে, যদি কারও কাছে এক জোড়া কাপড় থাকে আর সে সর্বদ এই ভাবে সন্ত্রস্ত থাকে যে ইহাতে ময়লা লাগল কিনা বা দাগ লাগল কিনা এবং এই ভাবে গরীবের প্রতি তার মধ্যে ঘৃনার সৃষ্টি হয় তবে ঐ লোক নিশ্চয়ই তাহরীকে জাদীদের এই দাবীর প্রতি আমল করেনি ইহার তুলনায় আমি ঐ ব্যক্তিকে অধিকতর আড়ম্বরহীন বলব যার ২/৩ জোড়া কাপড় আছে এবং সে ওগুলো সম্বন্ধে এইরকম সাবধানতা অবলম্বন করে না যাতে আমীর এবং গরীবের মধ্যে একটা বিশেষত্ব সৃষ্টি হয়। ফলকথা এই যে, পোষাক পরিচ্ছদে এই রকম বাহ্যিকতা বা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। মানব জাতির মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীর সৃষ্টি করে, তা সুন্নতের আওতা বহির্ভূত এবং সমস্যা সৃষ্টিকারী, কাপড়ের পরিমান দিয়ে তা বিচার করা যায়না। এই হেদায়াত, কোন সাময়িক নয় বরং স্থায়ী হেদায়াত। কেননা ইহার ফলেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দুর হ'তে পারে।"

[খুতবাজুময়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ সন]

গ্রামের লোকেরা অনেকটা পোষাক পরিচ্ছদের বাহ্যিকতা মুক্ত। শহরের লোকেরা অধিকাংশই এই ব্যধিগ্রস্ত এবং তাদের উদ্দেশ্যে হুজুর (রাঃ) বলেছেন,

"শহরের লোকেরা পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে বহু ভুল করছে। বিনা প্রয়োজনেও কাপড়-চোপড়ে বেশী পয়সা খরচ করে। যদিও সৌন্দর্য্যের জন্য এবং লজ্জা নিবারনের জন্যে পোষাক পরিধান করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সৌন্দর্য্যকে পিছনে রেখে ফ্যাশন এবং বাহাদুরীর জন্যেই পোষাকের ব্যবহার হচ্ছে। বহুলোক কেবল দেখানোর জন্যেই পোষাকের ব্যবহার করে থাকে।" [খুতবা জুময়া ৪ঠা ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ সন]

পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই এই রোগে আক্রান্ত বেশী। এই জন্যে তাদের দৃষ্টিও ইহার প্রতি আকৃষ্ট করা দরকার। যেমন হুজুর (রাঃ) বলেছেন ;

"ভালভাল পোষাক মেয়েদের নিকট পছন্দনীয় এই ব্যাপারে তারা বেশ অপচয়ও করে থাকে। ফলকথা এই যে, বহু সংসার শুধু ভাল পোষাক পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারাদির জন্যে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়েছে ইংরেজ অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী জাতি কিন্তু তাদের মধ্যেও বহুধনী লোক মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ খরচের জন্যে ধ্বংশ হয়ে গেছে।" [খুতবা জুময়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ সন]

মেয়েদের লেস্ ফিতা ইত্যাদি ক্রয় বাবদ মনে হয় কাপড়ের চেয়ে বেশী খরচ হয়। এই ব্যাপারে তাদের ফিরানোর জন্যে হুজুর (রাঃ) বলেন;

"কাপড় যতই মুল্যবান হোক তা' কিছুদিন কাজে লাগে। কিন্তু লেস্ বা ফিতা কাপড়ে লাগান হয় এবং যখন তখন বদলানো যায়. মেয়েরা নিত্য নুতন ফ্যাশন দেখে তা ক্রয় করে এবং পুরাতনটা বদলিয়ে নুতনটা লাগায়। আমার ধারণা এই যে কাপড়ে

এত খরচ হয় না, যত খরচ হয় এক ফ্যাশন-দোরস্ত মেয়ের ফিতা ইত্যাদি ক্রয় করতে। কেননা তা ইচ্ছা মত বদলানো হয়।"

[খুতবা জুময়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ সন]

পোষাক পরিচ্ছদের ফ্যাশন এবং বাহিকতা একেত অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতির কারণ হয় অপর পক্ষে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী থেকেও ফিরিয়ে রাখে। হুজুর (রাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

"ফলকথা, ইসলাম এটাই আশা করে, আমাদের মন সব কিছু থাকে মুক্তি লাভ করে খোদার স্মরণে নিয়োজিত থাকে। ইহাই সত্য কথা। মানবের মধ্যে বৃহত্তর অংশের অভিজ্ঞতা প্রসূত কথা ইহাই। যদি কোন ব্যক্তি তন মন দিয়ে খোদার ধ্যানে মশগুল থাকে তবে তার পোষাকের প্রতি নজর দেয়ার ও সময় থাকবেনা।

মানুষের দৃষ্টি এক বিষয় থেকে মুক্তি পেলেই অন্য একটি কাজ করতে পারে। যদি আমরা আমাদের দৃষ্টি এই ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ রাখি তবে ইসলামের উন্নতির কাজ আমরা কখন করতে সক্ষম হব? এই জন্যেই ইসলাম খাওয়া দাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদে আড়ম্বরহীনতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে যাতে ছোট ছোট বিষয়ের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টি বিশেষ কাজের প্রতি নিবদ্ধ হয়।"
(খুতবা জুময়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ সন)

অলঙ্কারাদির ব্যাপারে আড়ম্বরহীনতা

অর্থনীতিবিদদের সম্মীলিত মতামত এই যে, অলঙ্কারাদি সম্পদের সাকুলেশনের সবচেয়ে পরিপন্থী। দেশ এবং জাতির জন্যে ইহার চেয়ে অযথা খরচ আর নেই যার ফলে বহুল পরিমানে অর্থ এক জায়গায় আটকে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বহু সমঝদার লোকদের মধ্যে অলঙ্কারাদির প্রতি আকর্ষন প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। যদি অলঙ্কারের মাধ্যমে সম্পদের বাহাদুরী দেখানোর ইচ্ছা থাকে তবে ইহার চেয়ে খারাপ আকাঙ্খা আর নেই। এবং ঐ আকাঙ্খা পুরনের জন্যে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হয়। আগের দিনে সম্পদকে হেফাজত করার জন্যে অলঙ্কারাদি তৈরী করা হত। আজ ব্যাঙ্কের যুগে তার প্রয়োজন নেই। খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এই প্রসঙ্গে বলেন,

"বস্তুতঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে অলঙ্কার একটি অপকারী বস্তু। কেননা ইহার মধ্যে জাতীয় সম্পদ বিনা কাজে আটকে থাকে এবং ঐ সোনা রূপা জমা করার বাসনা যার কথা কোরআন করীমে বলা হ'য়েছে যে, যারা সোনা রূপা একত্র করবে কেয়ামতের দিন ঐ সোনা রূপা গরম করে তাদের শরীরে দাগ দেয়া হবে।"
(খুতবা জুময়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ সন)

তাহরীকে জাদীদের প্রথম পর্য্যায়ে হুজুর (রাঃ) অলঙ্কারাদি তৈরী করা নিষিদ্ধ ঘোষনা করে দিয়েছিলেন পুরাতন অলঙ্কার ভেঙ্গে নুতন অলঙ্কার তৈরী করাও নিষিদ্ধ ছিল। কেননা ইহার মধ্যেও সোনা রূপার কুফল ছাড়াও বেশ অংকের টাকা পয়সা খরচের সম্ভাবনা ছিল। ইসলাম টাকা পয়সা জমা করতে নিষেধ করেনি। বস্তুতঃ ঐ রকম জমা করা থেকে বিরত থাকতে বলে যার মাধ্যমে ধন সম্পদ আটকা পড়ে থাকে এবং কারও কোন কাজে আসেনা। ইহার ফলে জাতীয় অর্থনীতি ব্যপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হুজুর (রাঃ) এই প্রসঙ্গে বলেন,

"এখানে ইসলাম টাকা পয়সা জমাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। যদি টাকা পয়সা জমাতে নিষেধ করত তবে যাকাতের মসালার প্রয়োজন হ'ত না। টাকা পয়সা জমা করা নিষেধ নয় বরং ঐ প্রকার

জমা করা নিষেধ যাতে মানব মণ্ডলীর কোন উপকারে আসেনা। এক ব্যক্তির নিকট যদি দশ লক্ষ টাকা থাকে আর তা যদি ব্যবসায় লাগায় তবে পাঁচ দশ শত লোক উহা থেকে উপকৃত হ'তে পারে। তাই বড় ব্যবসায় বা জমীদারীর টাকা আটকে আছে বলা যায়না। উদাহরণ স্বরূপ যদি একজন জমিদারের নিকট দুই চার শত একর জমি থাকে সেইহেতু সে একাই জমি চাষাবাদ করতে পারবে না, সুতরাং তার ১২ ১৩ জন লোকের সাহায্য নিতে হবে এবং ইহার থেকে মোটামুটি নারী ও শিশু সহ শতেক লোক উপকৃত হতে পারবে। সমস্ত জাতী এ ভাবে উপকৃত হবে। যদি ইহার পরিবর্তে সে সোনা রূপা ক্রয় করে জমিয়ে রাখে তবে কারও কোনও উপকার হতে পারে না। সুতরাং টাকা পয়সা যদি এমন কাজে লাগান হয় যাতে কারও কোন উপকার হয় না ইসলাম ইহার ঘোর বিরোধী। এই রকম লোকদেরই কেয়ামতের দিন সাজা দেয়ার কথা খোদা তায়ালা কোরআনে বর্ণনা করেছেন। (খুতবা জুমুয়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ সন)

যেহেতু অলঙ্কারের প্রতি মেয়েদের অধিক টান আছে। খুশীর দিনে তাদের অলঙ্কার ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হ'য়েছে। হুজুর (রাঃ) এই প্রসঙ্গে বলেছেন।

"মেয়েরা অলঙ্কার পছন্দ করে এবং মেয়েদের এই দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং কোরআন করীমে "ইউনাশ্যাও ফিল হিলিয়া" অর্থাৎ মেয়েরা অলঙ্কারের মধ্যে প্রতিপালিত হয় বর্ণনা মোতাবেক মেয়েদেরকে সামান্য অলঙ্কার ব্যবহার করার অনুমতি দেয়াহল। যে ভাবে রেশমের ব্যবহার আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের জন্যে নিষেধ করেছেন। মেয়েদের সুযোগ দিয়েছেন যে মেয়েরা কিছু অলঙ্কার কিছু রেশমী বস্ত্র পরিধান ক'রে শোভা বর্ধন করতে পারে। এই জন্য আমিও এই অনুমতি দিয়েছি যাতে শাদী বিয়েতে সামান্য কিছু অলঙ্কার তৈরী করা যেতে পারে। কিন্তু ইহার পর নূতন কোন অলঙ্কার তৈরী করার অনুমতি দেয়া হয় নি বিশেষ অবস্থা এবং অনুমতি ব্যতিত। ভাঙ্গা অলঙ্কার মেরামত করা যেতে পারে। অলঙ্কার দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে বহু বাধার সৃষ্টি করে থাকে। দেশের কোটি কোটি টাকা কোন কাজ ব্যতিত আটকে পড়ে থাকে। জাতীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় না। এক স্ত্রীলোকের নিকট যদি ৫/১০ হাজার টাকার গহনা থাকে তবে উহা কার কি উপকারে লাগতে পারে? যদি ঐ টাকা সে ব্যবসায় লাগিয়ে দিত এবং ১৫।২০ জন লোকের উপকারে আসত তবে দেশ ও জাতীর বহু উপকার সাধিত হত এবং তারও লাভ হত। যেহেতু নিজের লাভের সাথে অন্যেরও লাভ হ'য় সেজন্যেই শারিয়তে ইহার (ব্যবসার) অনুমতি দান করেছে। ইসলাম অর্থের এইভাবে সদ্ব্যবহার পছন্দ করে, যে ভাবে লোকের উপকার হয়। ঐ পন্থায় পছন্দ করেনা যাতে চক্ষু আনন্দ পায় কিন্তু লোকের কোন উপকারে আসে না। সুতরাং অলঙ্কার তৈরী করার প্রতি বাধা নিষেধ না শুধু ধনী গরীবের বিশেষত্ব দূর করার জন্যে বা ধর্মীর আদেশ পালনের জন্যে বরং নিজের দেশের উন্নতির জন্যেও কম জরুরী নয়। (খোৎবা জুমুয়া ৪ঠা; ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ইং।

আসল কথা এই যে, অলঙ্কার কম তৈরী করে এবং আড়ম্বর হীন হওয়ার চেষ্টা করে, টাকা পয়সা অযথা না আটকিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যে খাটান উচিৎ যাতে দেশের ও দশের উপকার হয়। তাহরীকে জাদীদ এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনের ঘোষণা প্রত্যেক আহমদী থেকে এই আশাই পোষণ করে থাকে। (ক্রমশঃ)

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)

রাবওয়া, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ইং

অনুবাদ ঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

মোমেনদিগকে তিনটি ফ্রন্টে শয়তানী আক্রমণ সমূহের মোকাবেলা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থকিতে হইবে।

একটি হইল তরবিয়তের ফ্রন্ট; দ্বিতীয়টি বহিরাগত আক্রমণের ফ্রন্ট এবং তৃতীয়টি মুনাফাকাতের ফ্রন্ট।

আমাদের চেষ্টা করা উচিত এবং দোয়াও করা উচিত; আল্লাহতায়ালা যেন উক্ত তিনটি ফ্রন্টে আমাদিগকে শয়তানী আক্রমণ সমূহের মোকাবেলা করার তৌফিক দেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই মাত্র দুই সপ্তাহ হইল, পূর্ব আফ্রিকা হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, সেখানেও পাদ্রীরা একত্রে বসিয়া সলা-পরামর্শ এবং পরস্পর আলোচনা করিয়াছে যে, যে গুলিকে তাহারা তাহাদের সফলতা লাভের পথ যলিয়া মনে করিত, উহাতো তাহাদিগকে অকৃতকার্যতা ও ব্যর্থতায় উপনীত করিয়াছে এবং এ অঞ্চলের মানুষ খ্রীষ্টধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না। এজন্য তাহাদের ভাব-ধারনা ও স্বভাব এবং প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের মধ্যে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন অনুমোদন করা উচিত যাহাতে ঐ লোক দিগকে তাহারা খ্রীষ্টান বানাইতে পারে; তথা, তাহাদের উপর খ্রীষ্টধর্মের লেবেল যেন লাগিয়া যায়, যদিও তাহারা প্রস্তর উপাসকই থাকুক বা বৃক্ষ-পূজারীই হউক, কিম্বা তাহারা যাদু বা ঝাড়-ফুঁকে বিশ্বাসীই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না; তবুও খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে ঐ সব বিষয়ের দ্বার খুলিয়া দাও। ইহার ফলে তাহাদের উপর এই লেবেল তো লাগিয়া যাইবে যে ইহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে।

সুতরাং যে ধর্ম এত হীন প্রকারের পদ্ধতি ও হাতিয়ার অবলম্বনের ও প্রয়োগের পক্ষপাতী হয়, তাহার অবস্থা ও প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তো আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। মোট কথা বর্তমান কালে তাহারা নিজেদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে সৎ বা অসৎ, যে কোন উপায়েই হউক, তাহারা যেন ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্ট ধর্মের সফলতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের তথা আহমদীয়া জমাতের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষই হইল ইসলাম ধর্মকে সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করা। এদিকে সব চেয়ে বড় আক্রমণ খৃষ্টীয় ফ্রন্ট হইতে চালান হইতেছে।

আমরা একান্ত দুর্বল ও অত্যন্ত দরীদ্র এবং নিতান্তরূপে রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাব-প্রতিপত্তি হইতে বঞ্চিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহতায়ালা আপন অনুগ্রহক্রমে আমাদিগকে এই তৌফিক দিয়াছেন যে, আমরা খৃষ্টধর্মের একটি অত্যন্ত প্রবল আক্রমণকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রতিহত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু আমাদের কাজ এখনও শেষ হয় নাই এবং না তো সেই সময়ই আসিয়াছে যে, আমরা মনে করি যে, আমাদের এখন নিজেদের কুরবানীর গতিকে আরও সতেজ করার প্রয়োজন নাই, আমরা কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছি অথবা কৃতকার্যতা আমাদের সামনেই রহিয়াছে, অতি শীঘ্রই আমরা কৃতকার্য হইয়া যাইব। বস্তুতঃ সেই সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। উহার জন্য অনেক বেশী এবং চরম কুরবানী আমাদের দিতে হইবে। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং ইসলামের আল্লাহ-তায়ালার জন্য মানব-হৃদয়গুলিকে যখন জয় করার প্রশ্ন, তখন অর্দ্ধ বা চতুর্থাংশ হৃদয় জয় করার প্রশ্ন উঠে না। ইহা হইতে পারে না যে, হৃদয় অর্ধেক তো শয়তানের করতলে থাকুক, আর অর্ধেক খোদার বশ্যতায় আসুক। সকল হৃদয়ই জয় করিতে হইবে। সমস্ত হৃদয়কেই আল্লাহতায়ালার চরনে আনিয়া রাখিতে হইবে। খৃষ্টধর্মের মত আমরা ইহা তো ভাবিতেও পারি না যে, দুর্বলতা বশতঃ অপরের মন যোগানোর উদ্দেশ্য অপরের মতের সহিত মত মিলাইয়া ইসলামের বিধি-বিধান শিথিল করিয়া দেই। অপরিবর্ত্তিত সম্পূর্ণ ইসলামই তাহাদেরকে গ্রহণ করিতে হইবে ইনশাআল্লাহ; এবং সম্পূর্ণ হৃদয় ও আত্মা এবং মস্তিষ্ক সহকারে তাহাদিগকে তাহাদের রব আল্লাহতায়ালার সমীপে ঝুঁকিতে হইবে। ইহাই আমাদের জীবন ও আমাদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ ও উদ্দেশ্য, যাহার জন্য আমাদিগকে চরম ও পরম কুরবানী পেশ করিতে হইবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের ইহার তৌফিক দিন। আমিন।

তৃতীয়তঃ আর একটি ফ্রন্ট রহিয়াছে যাহার উল্লেখ আল্লাহতায়ালা (কোরআন শরীফের) প্রথমেই করিয়াছেন এবং পরে এ বিষয়ে বিভিন্ন আকারে বিস্তারিত ও বিশদ আলোচনা কোরআনে আসিয়াছে। উহা হইল মুনাফাকাতের (কপটতার) ফ্রন্ট। সুরা বাকারার প্রারম্ভেই মুনাফাকাত সম্বন্ধে যে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে অনেকগুলি আয়াতে এ বিষয়ে বেশ বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে, কেননা মুনাফাকাত এমন একটি রোগ, যাহার ফলশ্রুতি হিসাবে আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে যে শাস্তি নির্ধারিত ও প্রযোজ্য হয়; উহার মত বড় শাস্তি অন্য কোন গুণাহ্ বা পাপের ফলশ্রুতি হিসাবে প্রযোজ্য হয় না। কোরআন করীমে বলিয়াছে—

ان المنا فقين فى الدرك الا سفل من النا ر

অর্থাৎ মুনাফেকের জন্য যে শাস্তি খোদার নিকট নির্ধারিত আছে উহা মুশরেকের বা কাফেরের জন্য নির্ধারিত নহে।

আল্লাহতায়ালা সুরা বাকারার ঐ আয়াতগুলির মধ্যে মুনাফেকদের স্বভাব ও চরিত্র এবং কর্ম-পদ্ধতির উপর বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করিয়াছেন। কোরআন করীম অন্যত্র উক্ত আয়াতগুলির বিষয় বস্তুকে আরো স্পষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছে। এতদ্বারা যে বুনিয়াদী ও মৌল বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, উহা এই যে, মুনাফেক মুসলেহ (এসলাহ্ বা সংশোধন ও শান্তি স্থাপন কারী) হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ তাহার তরফ হইতে এলান (প্রকাশ) এই করা হয় যে, সে জামাতের মধ্যে এসলাহ্

করিতে চায়। কিন্তু উদ্দেশ্য হইয়া থাকে জামাতের মধ্যে ফেসাদ অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা। এজন্য খুবই বেশী হোশিয়ার ও সতর্ক থাকার প্রয়োজন। এতদোদ্দেশ্যে যে বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই যে, যুগ-খলিফা বা যুগ-ইমাম অথবা যদি রসুল স্বয়ং জীবিত থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত নিজেদেরকে আবদ্ধ ও সংযুক্ত কর এবং তাঁহাকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাক। তাহা হইলে তোমরা মুনাফাকাতের আক্রমণ ও আঘাত হইতে বাঁচিয়া যাইবে। রসুল করীম (সাঃ) ছিলেন কোরআন করীমের সম্বোধনের সর্বপ্রথম সর্বমহান পাত্র এবং চিরস্থায়ী জীবন তিনিই প্রাপ্ত হন। সুতরাং ইহার উপরই সবিশেষ জোর রহিয়াছে যে, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সহিত সংযুক্ত হও অধ্যাত্মিকরূপে। কেননা তিনি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত। এজন্য প্রকৃত বিষয় এই যে, এখনও এই আদেশই বলবৎ যে, তাঁহার (সাঃ) দিকে ধাবিত হও তাঁহাকে জড়াইয়া ধর এবং তাঁহার আদর্শ অনুসরণ কর। তাহা হইলে মুনাফেকের অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া যাইবে। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নায়েব (স্থলাবিষিক্ত বা প্রতিনিধি) আল্লাহ্‌তায়ালা দুনিয়ায় সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে সব চেয়ে বড় নায়েব এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সবচেয়ে বেশী প্রিয় আধ্যাত্মিক পুত্র রূপে দুনিয়ায় প্রেরন করিয়াছেন, অতঃপর খোলাফতের একটি সেলসেলা বা শৃঙ্খল দুনিয়াতে কায়েম করিয়াছেন। মূল তো হযরত মোহাম্মদই (সাঃ), প্রকৃত ও মৌলিক জীবন তো তাঁহারই জীবন। নেফাক ও কুফুর হইতে পরিত্রানের আসল চাবীকাঠিতো মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসা স্থাপনেই নিহিত, অতপর সেই ব্যক্তিদের প্রতি ভালবাসা নিবেদনে, নিহিত যাহাদের সম্বন্ধে রসুল করীম (সাঃ) নিজে নির্দেশ দিয়াছেন, যে তাহাদের আনুগত্য স্বীকার কর, এবং তাহাদের সহিত প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর।

যে পদ্ধতি মোনাফেক অবলম্বন করিয়া থাকে উহার উপর কোনআন করীম বিশদভাবে আলোকপাত করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাহাদের একটি পদ্ধতির কথা বলিয়াছে যে, মোনাফেক এতেরাজ (আপত্তি) করে যে, هُوَ اُذُنٌ অর্থাৎ তিনি (রসুল করীম) তো 'কান'। মানুষ আসে এবং তাঁহার কান ভারী করিয়া যায় এবং সেই কথাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই দিনে ও আজিকার দিনে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলিতে থাকিবে। তাঁহার যে সকল আজেয, অধম ও তুচ্ছ বান্দা আল্লাহতায়ালার নামে তাহার তরফ হইতে তাঁহার প্রতিনিধি, তাঁহার খাদেম ও তাঁহার প্রেমিক এবং সেই একটি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র দণ্ড হিসেবে যাহাকে আল্লাহতায়ালা তাঁহার দুই আঙ্গুলীর মধ্যে ধারণ করিয়া নেন এবং এলান করেন যে, তাহার দ্বারা তিনি তাঁহার কুদরত ও শক্তির প্রকাশ করিতে চান, এই হিসাবে যাহারা আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে নিয়োজিত ও দণ্ডায়মান হন, তাহাদের উপর এই প্রকারের আপত্তি হইতে থাকিবে ও হইতেছে এবং সর্বদা হইবে।

সুতরাং আল্লাহতায়ালা মুনাফেকের একটি অত্যন্ত স্পষ্ট আলামত ধরাইয়া দিয়াছেন যে, তাহারা বলিয়া থাকে যে, কান ভর্তী কারীগণ (খলিফার) কান ভর্তী করিয়া দেয়, আর তিনি (সেই সব কথা শুনিয়া) চিন্তা ভাবনা না করিয়াই ফয়সালা করিয়া দেন। অথচ যাহাকে আল্লাহতায়ালা এই (খোলাফতের) মোকামে খাড়া করেন তাহাকে সুক্ষ্মদর্শীতাও প্রদান করেন এবং সেই সুক্ষ্মদর্শীতা অবশ্যই সাধারণ মোমেন-

গণের চাইতে অধিকতর হইয়া থাকে। সাধারণ মোমেনের সূক্ষ্মদর্শীতা হইতেও হযরত নবী করিম (সঃ) সাবধান করিয়াছেন। মোমেনকে আল্লাহ-তায়ালা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সূক্ষ্যদর্শীতা দান করিয়া থাকেন সুতরাং যে মোকাম একজন মোমেনের বলা হইয়াছে তোমরা কি তাহাও যুগ-খলিফাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নও এবং বল যে, "হোয়া উযোনুন"? (অর্থাৎ তিনিত কান তথা তিনি চতুর্দিক হইতে মানুষের কথা শুনেন—অনুবাদক)। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মোকাবেলায় যুগ-খলিফার মর্যাদাই বা কি? যখন তোমাদের বড়গণ মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে ছাড়ে নাই, তখন তোমরা যদি আমার উপর অথবা আমার পূর্ববর্ত্তীগনের বা পর-বর্ত্তীগনের উপর কটাক্ষ ও আপত্তি করিয়া থাক, তাহার মূল্যই বা কী? আল্লাহতায়ালা উক্ত আয়াতে উহার এই উত্তর দেন নাই যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) "উযোনুন" নহেন বরং তাহাদের এই উক্তির যথার্থতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, "হ্যা, তিনি ত "উযোনুন"-ই বটে— তিনি কথাবার্ত্তা শুনেন কিন্তু তিনি উহার পর যে ফয়সালা করেন, তাহা তোমাদের মঙ্গল সূচক হইয়া থাকে, তোমাদের অমঙ্গল সূচক হয় না। এবং শোনা প্রয়োজনীয়। কেননা প্রত্যেক জায়গায় সর্বপ্রকারের কথা তাঁহার নিকট পৌঁছা উচিত। অন্যথায় সঠিক তথ্য ও সিদ্বান্তে পৌঁছান যায় না। মোট কথা, প্রত্যেক স্থান হইতে খবরাখবর ও তথ্যাবলীর কানে যাওয়াতে মোনাফেকের এ সিদ্বান্ত নির্ণয় করা যে, এতদ্বারা অমঙ্গলের সৃষ্টি হইবে ইহা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কেননা খোদার কোন বান্দা সঠিক সিদ্বান্তে না পৌঁছিয়া কোন কাজ করেন না; আল্লাহতায়ালা স্বয়ং তাঁহার পথ প্রদর্শন করেন যদ্বারা তিনি সঠিক সিদ্বান্তে পৌঁছান সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, তিনি (হযরত মোহাম্মদ অথবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত) "উযোনুন" তো বটে কিন্তু "উযোনো খাইরিল লাকুম"—তোমাদের কল্যানের জন্যই তিনি শ্রবন করেন। কথা শ্রবন করিয়া তিনি যাহা ফয়সালা করিবেন তাহা তোমাদের পক্ষে কল্যানজনক ও উত্তম হইবে।

পুনঃ কুধারনা পোষনের অভ্যাসও মোনাফেকের মধ্যে থাকে। তাহারা মানুষকে বলে, "অমুক কথা অমুক ব্যক্তি খলিফার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে। গত কালই এক ব্যক্তি আমাকে বলিলো যে, কোন ব্যক্তি বলিতেছিলেন যে, অমুক ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে কথা শুনিয়া গিয়া অন্য এক ব্যক্তির বরাত দিয়া উহা খলিফাতুন মসিহর নিকট বলিয়া দিয়াছে। অথচ সেই ব্যক্তি একটি শব্দও উহার সম্বন্ধে বলেন নাই। ঘরে বসিয়া। এই কুধারনা পোষন করিলেন যে কথা হয়ত গিয়া বলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু ইহাও স্মরন রাখা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে মোনাফেক সুলভ কথা-বার্ত্তা বলে, সে যে পাকা-পুক্ত মোনাফেক, তাহা জরুরী নয়। মোনাফাকাতের শুধু একটি রগ আছে তাহার মধ্যে। এজন্য চেষ্টা করা এবং দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা যেন এ প্রকারের মোনাফাকাতের রগ দূর করিয়া দেন। আঁ-হযরত (সঃ আঃ) এর যুগে অনেক গুলি মোনাফেক স্বভাব ব্যক্তি ছিল এবং দুর্বল ঈমানের ব্যক্তিগণও ছিল। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে এসলাহ্ (আত্ম-সংশোধন) এর সুযোগ দান করিলেন এবং পরে তাহারা অত্যন্ত মুখলেস কুরবানীকারী ও আত্ম-ত্যাগী হইয়া গেল। সুতরাং মোনাফেক সুলভ কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও দেখিয়া আমাদিগের যে সঠিক সিদ্বান্তে উপনীত হওয়া উচিত তাহা এইঃ— (১) আমরা এ প্রকারের মোনাফেক সুলভ কথাবার্ত্তার ফলে জামাতের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হইতে দিবনা (২) আমরা দোয়া এবং তদবীর চেষ্টা ও কৌশলের দ্বারা এ প্রকারের দুর্বল ব্যক্তিদের দুর্বলতা দূর করার প্রয়াস পাইব। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তৌফিক দিন। আমীন।

অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ।

'ওসিয়ত' ঃ অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদের ভিত্তিস্তর আদম স্মিথের (১৭২৩-১৭৯০) অবাধনীতি বা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ব্যবস্থা (Leissez Fair), কিংবা তারও আগের জন লকের (১৬৩২—১৭০৪) প্রকৃতিদত্ত অধিকারবাদ (Natural Right Theory)। এই সব মতে পদার্থ জগতের মধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নিয়মের মতই মানুষের অর্থনৈতিক অহংও একটি নিত্য বা সনাতন নিয়ম। ইহা চিরন্তন বা অপরিবর্তনীয়। সমাজেরর বাকী সকল নিয়ম-কানুন, নীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি সমাজের অর্থনৈতিকবৃত্তে সঞ্চরণশীল। এই বৃত্তটিকে সচল রাখাই সমাজের একমাত্র দায়িত্ব। তাহলেই গোটা সমাজদেহটি সঠিক-ভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে পারবে ; এবং আশানুরূপভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে থাববে। পুঁজিবাদ বিত্তবান এবং বিত্তহীনের মধ্যকার পার্থক্য এত বেশী বিশাল করে তুলেছে যে ইতিপূর্বে পৃথিবীর বুকে এমন অবস্থা আর কখনও বিরাজ করছিল বলে কেউ বলতে পারেন না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার উপকরণের মান এত দ্রুত ও এত বেশী উন্নত হয়েছে যে, বর্তমানে ধনী ও নির্ধনের জীবন-যাত্রার পদ্ধতিতে আসমান-জমিন পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। এই প্রকট পার্থক্য সাধারণ মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অপরদিকে, এই সময়ে সাধারণভাবে শিক্ষার প্রসারও ঘটেছে প্রভূত পরিমাণে। ফলে সাধারণ মানুষের মন অনেকটা সমৃদ্ধিলাভ করেছে। মানুষ নিজের ভাগ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। তার অধিকারবোধ তাকে স্বার্থকেন্দ্রী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কুফলের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুলেছে।

এই অবস্থায় পুঁজিপতি প্রতিভূদেরকে সমাজের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কিছু কিছু সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু এগুলো সমস্যার আসল সমাধানের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নয়। তাই, কোনো প্রকার সমাধানও সম্ভবপর হয়নি। ফলে, সাধারণ মানুষের নিদারুণ দারিদ্র আর দুঃখদৈন্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে, কমেনি। এই অবস্থায় মানুষের চিন্তা নতুন পথে পা বাড়িয়েছে।

গণতন্ত্র ও সমাজবাদ

পুঁজিবাদ-সৃষ্ট অবাঞ্ছিত অবস্থার মোকাবেলার জন্য মানুষ গণতন্ত্রের আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের গোড়ার কথা যদিও বেশ প্রাচীন, তবু এর বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে। মানুষ ভাবতে শুরু করে যে, ব্যক্তির হাতে নয়, রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত থাকবে সকল সমস্যার সমাধান। এবং এই রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশের সকল শ্রেণীর সকল স্বার্থের মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকতে

হবে, যাতে সকলের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং তদনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যায়। প্রথম প্রথম এই প্রতিনিধিত্বে দেশের কেবল ধনীক শ্রেণীর লোকরাই স্থান পেত বা স্থান করে নিত, কিন্তু পরবর্তীকালে ভোটাধিকারের পরিসীমা ব্যাপকতর করতে হয় এবং তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রমিকদের অধিকারও স্বীকৃতি লাভ করে। শ্রমিকরা যখন দেখতে পেলো যে, তাদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ মালিকগোষ্টিভুক্ত নির্বাচিত সদস্যরা দেশের আইন পরিষদে বা শাসনতন্ত্রে তাদের অধিকারকে যথাযথভাবে স্বীকার করে নিতে পারছে না, তখন তারা সরাসরি নিজেদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করলো। এবং নিজেদের উন্নতির জন্য পলিসি ও প্রোগ্রাম পেশ করলো। তাদের এই পলিসি ও প্রোগ্রামই সমাজবাদ বলে পরিচিত। এই সমাজবাদী ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন।

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র ও কার্ল মার্কস

এই শ্রমিক আন্দোলন প্রথমিক পর্যায়ে ছিল দেশভিত্তিক বা জাতীয়তাবাদী চরিত্রের। ফলে এই আন্দোলনের মাধ্যমে দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের শ্রমিকদের, যারা তখনও আন্দোলনে শরীক হয়নি বা হতে পারেনি তাদের, কোনো উপকার সাধন করা সম্ভব হতো না। তাছাড়া, শ্রমিকরা এও লক্ষ্য করলো যে, দেশে দেশে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন শ্রমিক আন্দোলনকে নাকাম করে দেওয়ার জন্য পৃথিবীর সকল দেশের মালিকরা একত্রিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছে। এই উভয় অবস্থাকে সামনে রেখে শ্রমিকরা তাদের আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক রূপ দান করার জন্যে প্রোগ্রাম গ্রহণ করে। এবং ঘোষণা করে যেঃ 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'।

এই আন্তর্জাতীয়তাবাদী শ্রমিক আন্দোলন নবতর প্রেরণা এবং শক্তিলাভ করে কার্ল মার্কসের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা থেকে। পুঁজিপতিদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন দেখে মার্কস ঘোষণা করলেন যে, শ্রমিকদেরকে সরাসরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে হবে। মার্কস দেখালেন যে, দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক সংস্কারের জন্য ক্ষমতা দখল অপরিহার্য। অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে এগিয়ে চলা নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এগিয়ে চলাই মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। মার্কস আরও বললেন যে, এই অবস্থায় পুঁজিপতিদের সঙ্গে সহ-অবস্থানের ধারনাকে বিলকুল বর্জন করতে হবে; নিরংকুশ ক্ষমতা শ্রমিদেরকেই এক চেটিয়া ভাবে অর্জন করতে হবে। এবং এই ক্ষমতা দখলের পথ গনতন্ত্র নয়, বিপ্লব।

বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেলে পরে 'একনায়কত্বের' অধীনে শ্রমিকদেরকে সংস্কৃত ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এবং আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে থেকে শ্রেণী বৈষম্য জনিত সকল ত্রুটি বিচ্যুতি মোচন করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে ত্রুটিমুক্ত উন্নত মানসিকতার অধিকারী শ্রমিকদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে শ্রমিকরা নিজেরাই নিজেদের যাবতীয় সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। পরিণামে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা মিটে যাবে। রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে।

বলশেভিজম

হেগেলের 'আদর্শিক দ্বন্দ্ববাদে' সামাজিক সকল সনাতনবাদকে (Absolutism) অস্বীকার করে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে পরিবর্তনশীলতার। আর সেই দ্বন্দ্ববাদের বস্তুগত ব্যাখ্যা দান করেছেন মার্কস। মার্কস সে পথে দেখিয়েছেন যে, দুনিয়ার ইতিহাস

সংগ্রামের ইতিহাস এবং সে সংগ্রাম শ্রেণীর সংগ্রাম। তাঁরও মতে ইতিহাসের প্রগতির পথে যে বিশেষ ধারাটি ক্রিয়াশীল তা অর্থনৈতিক। এই অর্থনৈতিক বিবর্তনের বিশেষ এক পর্যায়ে সমাজের আর সকল 'উপ-প্রতিষ্ঠান' তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। যার ফলে বিপর্যয় দেখা দেয়। মার্কসের মতে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার উপায় বিপ্লব। আর সে বিপ্লবের রূপ ও বৈশিষ্ট্য তিনি নিজেই অনেকাংশে নিরূপণ করে দিয়েছেন। আমরা সে কথার উল্লেখ করে এসেছি।

মার্কস নির্দেশিত উল্লেখিত পথে ১৯১৭ সালে জার শাসিত রাশিয়ায় এক রক্তঝরা বিপ্লবের সংঘটন করলেন ভি, আই, লেনিন। তবে এই বিপ্লবের পিছনে যত না কাজ করেছে সমাজতান্ত্রিক আশা ও আকাংখা, তার অনেক বেশী কাজ করেছে জার-শাসনের বিরুদ্ধে মজলুম জনতার ইচ্ছার আঘাত। সংগ্রামের পথে দলীয় পর্যায়ে উদারপন্থী মেনশেভিক বা সংখ্যালঘু নেতা মর্টোভকে পরাজিত করে গোঁড়া মার্কসবাদী উগ্রপন্থী বলশেভিক বা সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা লেনিন ক্ষমতায় আসেন এবং প্রলেতারিয়েতদের ডিক্টেটর হন।

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা ক্ষমতায় এসে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে প্রোগ্রাম হাতে নিল তার প্রধান প্রধান দিক ছিলো :

ক) ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ সাধন

খ) ব্যক্তি প্রচেষ্টার পরিবর্তে যৌথ প্রচেষ্টার প্রবর্তন,

গ) কায়িক শ্রমের রক্ষণ ও লালন

ঘ) মানসিক শ্রমের উৎসাদন

ঙ সকল সম্পদের সমাজীয় করণ

চ) সকল উৎপাদন ব্যবস্থার সমাজীয় করণ

ছ) শিক্ষা ব্যবস্থার সমাজীয় করণ

জ) সমাজীয় স্বায়ত্ব-শাসনের প্রতিষ্ঠা করণ

ঝ) কমুনিষ্ট আন্দোলনকে আন্তর্জাতীয় করণ

ঞ) সমর শক্তির উন্নতি করণ

চ. কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে শ্রমিকদের জন্য অশ্রমিক শিক্ষিত একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করণ—প্রভৃতি।

জাতিয়তাবাদ ও সমাজবাদ

পূর্ব-ইয়োরোপের দেশগুলোতে বলশেভিজমের প্রচারকে ইটালী ও জার্মানী সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা আশংকা করতে ছিল যে, বলশেভিজমের প্রচার তাদের নিজেদের আশা-আকাংখাকে রূপায়িত হতে দিবে না। তারা আশা পোষণ করতো যে, অদূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পতন ঘটবে। এবং তাদের পতনের পরেই পৃথিবীর বুকে রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করবে ইটালী ও জার্মানী। এই প্রাধান্য তাদের বিস্তার লাভ করবে বাকী দুনিয়াময় এবং সে দুনিয়াটাকে তারা খুশীমত শোষণ ও শাসন করতে থাকবে চিরটাকাল ধরে। এই ভয়ংকর ধারনার ভিত্তিতেই ইটালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ফ্যাসিবাদ; জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসীবাদ এবং স্পেনে জেনারেল ফ্রাংকোর নেতৃত্বে ফ্যালাংবাদ।

ইয়োরোপের প্রায় দেশেই তখন সাধারনভাবে বলশেভিজম সমাদর লাভ করছিল। সাধারণ মানুষ মনে করতো যে, বলশেভিকরা তাদের ঘরে ঘরে প্রয়োজনীয় সকল কিছুই পৌঁছে দিয়ে যাবে। বলশেভিজমের দূরবর্তী আকর্ষণে তারা অনেকটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে ছিল। এই অবস্থায় বলশেভিজমকে রুখবার জন্যে মুসোলীনী ও হিটলার ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের শানিত হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে

গেলেন। তারাও তাদের নিজ নিজ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দান করলেন এই বলে যে, এই সব ব্যবস্থায়—

ক) সম্পদের বণ্টনকে অধিকতর সুষম করা হবে ;

খ) শিল্প-বানিজ্য নিয়ন্ত্রনের ও উন্নয়নের ভার থাকবে রাষ্ট্রের হাতে ;

গ) পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে রাষ্ট্র ;

ঘ) দেশীয় শিল্প-কারখানা এবং ব্যবসার উন্নতির দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা হবে ;

ঙ) আন্তর্জাতিক বানিজ্য বৃদ্ধির দ্বারা বিদেশী সম্পদ আহরণ করা হবে বিপুল পরিমানে ;

চ) সাকলের সম্পদ রাষ্ট্রিয়করণ করার বদলে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদেরকে অধিক বেশী সম্পদ আহরণের সুযোগ দেয়া হবে এবং সেই আহরিত সম্পদ শ্রমিক ও গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।.....ইত্যাদি।

এ ছাড়াও, তাদের মতে বল্‌শেভিজম সাম্রাজ্যবাদীতার বিরুদ্ধে যা বলে বেড়ায়, তা ঠিক নয়। কেননা এতদিন ধরে দুনিয়ার দেশগুলোকে ইংলণ্ড আমেরিকা, ফ্রান্স শোষণ করেছে, এবারে তাদের শোষণের পালা এসেছে। তাদের যুক্তি হলো, অন্যেরা যা এতদিন করে এসেছে তারাও তা করতে পারবে এবং করাটাই কর্তব্য। তারা দাবী করলো যে, দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দ্রুত উন্নতির জন্যেই তারা এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায়। ফলে, তাদের কথায় জনসাধারণ অনেকটা বিশ্বাসী হয়ে পড়ে।

তারা আরও প্রচার করলো যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলো জার্মান ও ইটালিয়ানদের দমায়ে রাখার হীন উদ্দেশ্যে ভেতরে ভেতরে বলশেভিকদের সহায়তা করছে। তারা দেশবাশীকে বুঝাতে সক্ষম হলো যে, যেহেতু তারা গরীব. যেহেতু দেশের সমস্ত সম্পদ একযোগে তাদের মধ্যে বাটোয়ারা করে দিলে কোনো ফায়দাই হবে না। বরং ইংলণ্ড, আমেরিকার তার অন্যান্য দেশের সম্পদ নিয়ে আসতে পারলে তারাও অচিরেই ঐ সকল দেশের মতই সম্পদশালী হয়ে উঠতে পারবে। বলা বাহুল্য, নিজেদের দেশ-কেন্দ্রিক বা জাতিভিত্তিক এক ধরণের সমাজবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করলো তারা। যাকে বলা হলো, ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদ বা জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র।

এই জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রকে উগ্ররূপ দান করলো হিটলার। হিটলার তার দেশবাসীকে এই কথাটা শিখায়ে দিল যে, তোমরা জার্মানরাই পৃথিবীতে সবচে কুলীন মানুষ! তোমরা আর্য এবং আর্যদের মধ্যেও সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং তোমাদের হক রয়েছে বাদবাকী অকুলীন দুনিয়াটাকে শাসন করবার এবং শোষন করবারও। কারণ, মানুষই পশুকে শাসন করে, পশু মানুষকে নয়।

(ক্রমশ :—)

বিশ্ব-শান্তি কি সম্ভব?

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[আলোচ্য প্রবন্ধে ইতিপূর্ব অশান্তির পাঁচটি প্রধান কারণের কথা আলোচনা কর হয়েছে—পৃথিবীব্যাপী নির্লজ্জতার প্রবাহ, যুদ্ধপ্রস্তুতি ও প্রতিযোগিতা, বস্তুবাদী জীবন ধারার প্রবাহ, আদর্শজনিত মতবাদ সমূহের মিথ্যা প্রবাহ এবং মহাজাতীয় পর্যায়ে আদর্শগত নেতৃত্বের অভাব। এই সকল সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কোরআন করিমের শিক্ষার আলোকে বিশ্বশান্তির একটি কার্যকরী রূপরেখা সম্পর্কে ইতিপূর্বে চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ঃ প্রতিনিধিত্বমূল সরকার, রাষ্ট্র শাসক ও কর্মচারীগণের দায়িত্ব, সরকারের লক্ষ্য এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সংশোধন।]

(৫) **মূলধন বণ্টন ও বিনিয়োগ (অসিয়ত ব্যাবস্থা) ঃ** নৈতিক দৃষ্টিতে ধন বৈষম্য দূর করার জন্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুষম বণ্টনের জন্য ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে বলপূর্বক সম্পদ ছিনিয়ে না নিয়ে আংশিক ভাবে ধন সম্পদ রাষ্ট্রায়াত্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন ধনী ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ধন সম্পদ থেকে অবস্থা অনুযায়ী এক তৃতীয়াংশ ১/৩ থেকে এক দশমাংশ ১/১০ রাষ্ট্রয়ত্ত করে অবশিষ্ট অংশ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রচলিত আইন অনুসারে বন্টিত হবে। এই ব্যবস্থার ফলে সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন সমূহ পূরণের জন্য রাষ্ট্রের হাতে উপযুক্ত পরিমানে অর্থ সম্পদের সরবরাহ হতে থাকবে, দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রকর্তৃক এই ভাবে সংগৃহিত অর্থ রাষ্ট্রিয় ও নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার কার্যে ব্যয় করা যাবে (কারণ বলিষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ ও অনুশীল ব্যতিত কোন পরিকল্পনাই স্থায়ী সাফল্যলাভ করতে পারে না)। তৃতীয়তঃ এই সম্পদ কর্মক্ষম সম্পদহীন নাগরীকের মধ্যে পুনবণ্টন করতে হবে। এই ব্যবস্থার ফলে মানুষের মৌলিক স্বাধীনতাকে যেমন রাতারাতি হরণ করা হবে না, তেমনি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরীক মৌলিক প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের শুধু ন্যুনতম নিশ্চয়তাই লাভ করবেনা—আরো উন্নতির জন্য সকল প্রকার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করতে পারবে (২ঃ ১৯৬)।

(৬) **দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঃ**—আলোচ্য আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে উঠলে অনতিবিলম্বে সকল দরিদ্র ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থাপন্ন হওয়া এবং নিজ নিজ প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করা সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য হ্রাস পাবে ঠিকই, কিন্তু সারা পৃথিবীতে "Complete Equality" বা পূর্ণ সমতা বিধান করা কখনই সম্ভব নয়। অর্থ সম্পদই সকল সুখের মূল নয়। সেইজন্যই অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতার রীতি যদি কার্যকরী করা সম্ভব বলে ধরেও নেওয়া হয় (পৃথিবীতে কোন দেশেই তা সম্ভব হয় নাই। হতে পারে না), তবুও তার দ্বারা "সুখবোধের সমতা (Equal Happiness) নিশ্চিত

করা যায় না। একই পরিবারের দু'ভাই একই ধরণের লেখা পড়া করে এবং সমপরিমান পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হয়ে জীবনে সমপরিমান সুখ ও শান্তির অধিকারী হতে পারে না। মানব জীবনে সুখের মাপ কাঠি সম্পদের দ্বারা নির্নীত হয় না। দু'ভাইয়ের সন্তান সন্ততি জন্মাবে, সন্তানগুলো লম্বায়, চেহারায় স্বাস্থ্যে অথবা বুদ্ধিমত্তা এবং মেধায়, একরকম হবে এমন কথা ভাবতেই পারা যায় না; অথচ সুখবোধের সংগে অর্থ ছাড়াও স্নেহ, ভালবাসা, সৌন্দর্য্য আরও কত কি জড়িত। এই সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র সমতা বিধানের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকবেই- ইহা চিরন্তন সত্য। (৫ঃ১৪)। অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে, একদিকে অগনিত মানুষ জীবন ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র আশ্রয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অভাবে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকবে আর অন্যদিকে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী ব্যক্তি বিলাসীতার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকবে! এই অবস্থা যাতে সৃষ্টি হতে না পারে তারজন্য রাষ্ট্রের উপর সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের নিম্নতম সংস্থানের নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে এবং অন্যদিকে সম্পদশালী ব্যক্তিদের নিকট থেকে উপরোক্ত (৫ নম্বর) নীতি অনুযায়ী সম্পত্তির কিছু অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে। এইভাবে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় করতে হবে (Comprise between Economic welfare and Individual Freedom)

(৭) যুদ্ধবাদী নীতি পরিবর্জন ঃ—

যুদ্ধব্যয়ের পরিসীমাকে যথাসম্ভব হ্রাস করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি এবং সংযমপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। যুদ্ধলিপ্ত অবস্থায় শান্তির সকল সম্ভাবনাকে চেষ্টা করে দেখাতে হবে। আক্রান্ত বা অত্যাচারিত না হলে কোন প্রকার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যাবে না। (২২ঃ৪০)। একথা সত্য যে, জাতীয় স্বাধীনতার মূল্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তারজন্য আন্তর্জাতিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করতে হবে (যদি সেইরূপ কার্যকরী ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা থাকে)। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, যুদ্ধের ফলে শুধু প্রাননাশই হয় না, সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীরও সৃষ্টি হয় এবং জটিলতার রূপ পরিগ্রহ করে। সে জন্যই শান্তির সকল সম্ভাবনার কথা ভাবাই উত্তম। বিশেষ করে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য এবং "Cold war" প্রতিযোগিতার জন্য ছোট, বড়ো সকল রাষ্ট্রই যে পরিমান অর্থ সম্পদ, শক্তি এবং সময় নষ্ট করছে সেগুলো যদি মানব কল্যাণ মূলক কার্যে লাগানো যেত তাহলে পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যেত। এই কারণে নিরাপত্তামূলক সম্মিলিত আন্তর্জাতিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

(৮) আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য নীতি নির্ধারনী সুপারিশ ঃ— আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠান সর্বজনীন ভিত্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যৌথ প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছাড়াও একটি "সম্মিলীত আন্তর্জাতিক বাহিনীর" তত্ত্বাবধান করবে। জাতীয় পর্যায়ে যে সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে সেই সকল সমস্যা এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা এবং সিদ্ধান্ত সমুহ প্রতিনিধিত্ব মূলক হতে হবে প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচালনা হওয়ার কারনে কোন রাষ্ট্রই অভিযোগ করতে পারবে ন।

যে, রাষ্ট্রির সার্বভৌমত্বের কোন ক্ষতি করা হয়েছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত মূল-নীতি নিম্নরূপ হবে (৪৯:১০ আয়াত) দ্রষ্টব্য।

(ক) যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে অন্যান্য সকল রাষ্ট্র বিবাদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতা করবে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তা মানতে হবে। মানতে রাজী না হলে নিম্নের খ) দ্রষ্টব্য।

(খ) যদি কোন রাষ্ট্র সম্মিলীত রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত মানতে রাজী না হয় এবং অথবা আক্রমনাত্মক নীতি বর্জন না করে তাহলে "সম্মিলীত আন্তর্জাতিক বাহিনী" আক্রমন কারী রাষ্ট্রকে বাধা প্রদান করবে। এমতাবস্থায় পৃথিবীর কোন একক শক্তি "সম্মিলীত আন্তর্জাতিক বাহিনীর" মোকাবেলা করতে সাহসই পাবে না এবং বাধ্য হয়েই আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান হতে পারবে। বাস্তবক্ষেত্রে সম্মিলীত আন্তর্জাতিক, বাহিনীর আস্তিত্বই যথেষ্ঠ। সত্যিকার যুদ্ধ কখনই সংঘটিত হবে না। স্বাভাবিক কারনেই জাতীয় পর্যায়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য রাশি রাশি অর্থ ব্যয়ের কোন সার্থকতাই থাকবে না। শুধু আভ্যন্তরীন শান্তি ও শৃংঙ্খলার জন্য আধা সামরীক বাহিনী এবং সাধারণ অস্ত্র-শস্ত্রই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

(গ) যখন উপরোক্ত উপায়ে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে তখন আন্তর্জাতিক সংস্থা শান্তিস্থাপনের শর্তসমূহ নির্ধারণ করবে। যে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হবে তার মধ্যে প্রতিরোধ বা শাস্তিমূলক কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ছোট অথবা বড়ো, বিজিত অথবা বিজয়ী কোন শ্রেণী বা রাষ্ট্র বা সম্মিলিত বাহিনী শুধু ক্ষুদ্রত্ব বা বৃহত্বের জন্যই বিশেষ শাস্তি বা বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারবে না। যে বিষয় নিয়ে সংঘর্ষ বেঁধে ছিল, ন্যায্যভাবে তার মীমাংসা করতে হবে। কারণ এমনও হতে পারে যে আক্রমনকারী রাষ্ট্রের দাবী ন্যায়সঙ্গত ছিল। সুতরাং শুধুমাত্র আক্রমন বা অন্যায় করার অজুহাতে ঐ রাষ্ট্রকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(ঘ) কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন গোলযোগ মীমাংসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্র পরিচালক ও প্রতিনিধি-গনের উপরই মৌলিকভাবে বর্তাবে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা হস্তক্ষেপ করবে না। অবশ্য সমস্যার গুরুত্ব অনুযায়ী এবং রাষ্ট্রির পর্যায়ে সমাধানের উপায় না থাকলে আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এতদ্ব্যতিত কোন স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে কোন বিশিষ্ট জননেতাও আন্তর্জাতিক বিচারের দাবী করতে পারে এ সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ম কানুন উপরোক্ত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে তৈরী করা যেতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ, জাতি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। যত শীঘ্রই এই রূপরেখার ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়, ততই শান্তি ও নিরাপত্তার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। অন্যায় শাসন শোষন, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিশেষ করে মহাযুদ্ধের অমানিশার অবসান হবে। যদি পৃথিবীব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক নব-জাগরনের সৃষ্টি না হয় এবং দৃষ্টিভঙ্গির সোংশোধন না করা হয়, তা হলে আমরা পছন্দ করি আর না করি আরো যুদ্ধ এবং মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবেই এবং আশান্তির দাবানল জলতে থাকবে। এ যুগের মহাসংস্কারক হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) বলেছেনঃ "যদি পৃথিবী নিজ অসৎ এবং অন্যায় কর্ম হইতে বিরত না হয়, অনুতাপ না করে তাহা হইলে পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর বিপদরাশি আসিবে এবং একটি বিপদ শেষ হইতে না হইতেই অন্য বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। অবশেষে মানুষ নিতান্তই কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া বলিবে 'একি হইতে চলিল!' আর বহুলোক বিপদের মধ্যে পড়িয়া পাগলের মত হইয়া যাইবে" ("শান্তির বার্তা" পৃঃ ৮)।

বাংলা ভাষায় আরবীর প্রভাব

—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

আল্লাতালা বলেন, "খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বয়ান" অর্থাৎ—আল্লা মানুষকে সৃষ্টিকরে তাকে ভাষা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে কোন বিশেষ ভাষার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। 'বয়ান' বা ভাষা বলতে মানুষের মুখের ভাষাকেই বুঝান হয়েছে যে ভাষায় মানুষ কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে, সেই সমস্ত ভাষাই এর অন্তর্গত।

কোরআনের মতে মানুষ মাত্রই এক জাতির অন্তভূক্ত। 'কানান্নাছু উম্মাতান ওয়াহেদ' আয়াতে একথাই বর্ণিত হয়েছে। তাই সমগ্রবিশ্বে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, কামনা বাসনা যেমন এক, ঠিক তেমনি তাদের ভাষাও মূলত এক। মানব সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষ যখন পৃথিবীর কোন এক বিশেষ অংশে বাস করত তখন তাদের কথ্য ভাষাও ছিল এক। কালে যখন মানুষ খাদ্যের সন্ধানে বাঁচার তাগিদে বিশাল বিশ্বের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ল তখন প্রকৃতির প্রভাবে আস্তে আস্তে তাদের ভাষা পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে নানা রূপ ধারণ করল। আধুনিক কালের মানুষ পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত ও প্রচলিত ভাষায় এক এক প্রকার নামকরণ করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, "ভাষা নদী প্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম। যখন একটি ভাষা প্রবাহের মধ্যে কোনও সময়ের ভাষা তাহার পরবর্তী ভাষা ভাষী দিগের নিকট একটি নূতন ভাষা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নূতন নাম করণ হইয়া থাকে।" (বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম খণ্ড) কিন্তু ভাষা যেখানে যেনামেই অভিহিত হোক না কেন প্রতিটি ভাষাই আল্লাতালার দান। অধ্যাপক আবদুল হাই বলেন, "ভাষা মরজীবনে খোদার অপরিসীম শক্তি সম্পন্ন দান।" (ভাষা ও সাহিত্য)।

পবিত্র কোরআনে আল্লাতালা বলেন, "ওমা আরছালনা মির রাছুলিন ইল্লা বিলিছানী কাউমিহী," অর্থাৎ-যুগে যুগে জাতিতে জাতিতে আগত প্রত্যেক নবীই তাঁর মাতৃ ভাষায় ঐশীবানী বা ওহী-ইলহাম লাভ করেছেন। কোরআনের এই বানীদ্বারা সমস্ত ভাষাকেই স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। কোরআনের মতে যেমন প্রত্যেক জাতিতেই নবীর আবির্ভাব হয়েছে, তেমনি প্রত্যেক জাতীর ভাষাই আল্লার মনোনীত ভাষা। তাই একজন বিশ্বাসীর কাছে ভাষা মাত্রই পবিত্র।

নিজের মাতৃভাষাকে ভালবাসা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলে অন্য ভাষাকেও ঘৃণা করলে চলবে না। ইসলামের মতে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ যেমন একই সম্প্রদায় ভুক্ত ঠিক তেমনি প্রতিটি ভাষাও মানুষের ভাষা হিসাবে সকলের কাছে অতি আপন ও পরম আদরনীয়। সাধ্যানুযায়ী ভাষা শিক্ষা করে প্রতিটি ভাষা থেকে জ্ঞান আহরণ করে নিজের ভাষাকে সমৃদ্ধ করা উচিত। কেননা প্রত্যেক ভাষারই মানুষের অভিজ্ঞতার ফল ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে যে ভাষায় নবীর আগমন হয়েছে সেই ভাষা শিক্ষা করাও মানুষের জন্য একান্ত জরুরী।

এক কালে ইংরাজী শিখলে কাফের হয়ে যাবে বলে মোল্লারা ফতোয়া দিয়েছিল। এটা নিঃসন্দেহে

সংকীর্ণতার পরিচায়ক। অপরূপ আজ যদি কেউ নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষাকে ম্লেচ্ছ বা ঘৃনিত বলে মনে করে, তাহলে সেটাও নিঃসন্দেহে তাদের সংকীর্ণতাকেই প্রকাশ করবে।

ভাষা মাত্রই অন্য ভাষার কাছে ঋণী। পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নেই যা অপর ভাষা থেকে গ্রহণ না করে বলিষ্ঠ ও উন্নত হতে পেরেছে। অধ্যাপক হরেন্দ্র চন্দ্র পালের "বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ" পুস্তকের ভূমিকায় অধ্যাপক আবদুল হাই বলেন, "প্রত্যেক জীবন্ত ভাষাই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে ঋণ হিসাবে শব্দ গ্রহণ করে নিজের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।" এটাতো হলো অনেক পরের কথা, আসলে প্রত্যেকটি ভাষাই যে মূলত এক তা আমরা আগেই বলেছি। ধীরে ধীরে সেইমূল থেকে সরে গিয়ে স্থান কালভেদে আজ নানা রূপে বিভিন্ন নামে পরিচিত। আমাদের মাতৃ ভাষা বাংলার কথাই ধরুন না। হাজার বৎসর আগে এর রূপ আর নাম কি ছিল? আর্য কথ্য ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য ভাষার সংস্পর্শে আজ যে রূপ গ্রহণ করেছে তাতো অতীতের কোথাও খোঁজে পাওয়া যাবে না?

ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রচলিত বাংলায় আড়াই হাজারেরও বেশী আরবী-ফারসী শব্দ আছে। ডক্টর লোকমান মকছুদ হিলালী Perso-Arabic Elements in Bengali পুস্তকে বাংলায় ব্যবহৃত ৫১৮৬ টি আরবী-ফারসী শব্দের উল্লেখ করেছেন।

কেহ কেহ বলেন বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন। আবার অনেক পণ্ডিতের মতে বাংলা ভাষা সংস্কৃত নয় প্রাকৃত ভাষা থেকে জন্ম লাভ করেছে। সে যাই হোক, এমনি করে আমরা যদি সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে হয়ত দেখতে পাব যে এই দুইটি ভাষাও অন্য কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আর্যদের কথ্য ভাষা ছান্দস এর মার্জিত রূপের নামই হল সংস্কৃত। পাঞ্জাবী পণ্ডিত পানিনী এই ভাষার সংস্কার সাধন করেন, তাই তার নাম সংস্কৃত। ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন যে আর্যরা মধ্য এশিয়ার কোন এক অঞ্চল থেকে ভারতে আগমন করেছিল। তারা এদেশে আসার কালে স্বাভাবিক ভাবে মূল অঞ্চলের ভাষাকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তাই আমরা কথ্য আর্য ভাষা থেকে উৎপন্ন প্রতিটি নূতন ভাষার মধ্যে এমন সব শব্দের হয়ত সন্ধান পেয়ে যাব যা এশিয়ার ঐ অঞ্চলের (আর্যদের আদি বাসস্থান বা বিচরণক্ষেত্র) মূল ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় আরবীর প্রভাব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। আরবী একটি প্রাচীন ভাষা। দুনিয়ার সকল ভাষাই আরবী থেকে সরা সরি শব্দ গ্রহণ করে উন্নত হয়েছে। জনাব মোহাম্মদ আহ্মদ মজহার তাঁর Arabic the source of all languages ও English Traced To Arabic নামক বিখ্যাত পুস্তক দ্বয়ে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান চৌচল্লিশটি ভাষার উৎপত্তি আরবী বলে প্রমান করেছেন। তিনি বাংলা সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান পুস্তকে তেমন কোন আলোকপাত করেন নাই। আমরা এখানে বাংলা ভাষায় প্রচলিত সেই সব আরবী শব্দ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব যেগুলি হিন্দু এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকেন। উল্লেখ যোগ্য যে বাংলাদেশের মুসলমানরা তাঁদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সামাজিক জীবনে এমন সব আরবী শব্দ ব্যবহার করে থাকেন যেগুলি অন্যেরা কম ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, হজ, যাকাত, তালাক, নিকাহ্, এবাদত, অজু, গোছল, আব্বা, আম্মা, খালা, খালু

অলিমা, কারী, কিতাব, ফতোয়া, কেকাহ্, হাদিস, ইজতেমা, কেরাৎ, জবান, ওয়াদা, হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজিব নফল, আজাব, গজব, হাশর, কিয়ামত, রহমত, আমানত, বাতিন, জাহির, কামিজ, বদন, রিজেক, হাল, হকিকত, কতল, কলেমা, কালাম, আলীম, রুকু, সেজদা, আকৃদ, এজিন, আমীর, গরীব কাজী মুর্শীদ, নবী, রছুল, ছালাম, মরদুদ, কাফির, ফেৎনা, কদম, ছফর, কুরবানী, জবেহ, জুলুম, তওবা, খেদমত, খাদেম, শরীফ, নাজিল, শরিয়ত, মোজেজা, ইন্তেজার, মারহাবা, তকবীর, এতিম, ছদ্‌কা ঈদ, ফিৎরা, তকদির, কবর ইত্যাদি। এধরণের আরো বহু শব্দ আছে যা প্রত্যেক বাংগালী মুসলমান তাঁর দৈনিন্দন জীবনে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এই শব্দগুলি সাধারণ ভাবে বাংগালী অমুসলমান সমাজে প্রচলন নেই। কিন্তু বাংলায় এমন কতকগুলি আরবী শব্দ আছে যা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাংগালীই ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, আদালত, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার, দলীল, কবুলত, খবর, রাজি, খারিজ, বাতিল, খেলাফ, দাখিল, জুলুম, সাহেব, তরফ, ফেরার, কায়েম, তারিখ, তফসিল, জমা, হিসাব, হেফাজত, হাকিম, সাকিন, জামিন, তলব, ওজর, কাগজ, কলম, মুহরির, মজদুর, বন্দর, শহীদ, হুকুম, আমিন, গোলাম, ময়দান ইত্যাদি।

এ ধরনের আরো বহু শব্দ বাংলা ভাষায় ছড়িয়ে আছে যেগুলি আজ বাংলা রূপেই পরিচিত। অথচ আদতে সেগুলি আরবী শব্দেরই বাংলা উচ্চারণ মাত্র। নিম্নে কতকগুলি নমুনা পেশ করা গেল ঃ

আরবী	বাংলা
আজারা (ভাড়া দেওয়া)	ইজারা
আল (গৃহবাসী)	আলয় (গৃহ)
আবা	বাবা
ইবতিনা (নূতন ঘরে স্ত্রী নিয়া প্রথম বসবাস করা,	বনি (প্রথম ব্যবহার বা বিক্রয় করা)
ইবরেশম	রেশম
ইবকা	বাকী
ইবহাল (কাউকে নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে দেওয়া)	অবহেলা
আচ্ছামা	আসামী
কেছাছ	কিচ্ছা
ইজাবা	জবাব
আজদাদ (বহু বচনে)	দাদা
ইজমা (একমত হওয়া)	জমা (একত্রিত,
জানা (বাহু)	ডানা
ইহ্‌ছাল (যুগের অনুপযুক্ত)	অচল
আহ্‌ছান (খুব ভাল)	আসান (সহজ, ভাল অর্থে)
আদ্ভা	অদ্ভুত
আদা	আদায়
ইদহাস (পেরেশানী)	উদাস
উস্তাজ	উস্তাদ
ইসতিসখার	মসকরা কথা (কথ্য)
বায়	বায়না
ফছাদ	ফেসাদ
হালাক (ধ্বংস)	হালকা (দুর্বল)
উশগুলাহ	মশগুল
উশনান (কাপড় ধোওয়ার স্নান জন্য ব্যবহৃত এক প্রকার গাছ)	
বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক)	বাবক
বা	বিবাহ
বাদাল	বদলা
বাজ (খারাপ অবস্থা)	বাজে
বাজিজ (বাজে কথা)	বাজে

আরবী	বাংলা
বাককুন	বকা
বুলবুল	বুলবুল
বান্দুকিয়া	বন্দুক
আশহাব	অশ্ব
আস্তাবল (চতুষ্পদ জন্তুর বাসস্থান)	আস্তাবল (ঘোড়ার ঘর)
ইলান	এলান
আইয়ান	নয়ন
ফিকির (চিন্তা ভাবনা)	ফিকির (চেষ্টা)
ইফইউন	অহিফেন
ছনদুক	সিন্দুক
আউজ	উচ্চ
তানবুল	তাম্বুল
জারী (সর্বদা স্থায়ী)	জারি
জাদ্দুন (দাদা, নানা)	জাদু (আহলাদ করে নাতিকে ডাকা)
জাম (মুখে এত খাদ্য দেওয়া যে চিবান অসম্ভব হয়ে যায়)	জাম (জমে যাওয়া নিশ্চল হওয়া)
হাদ্দুন (চূড়ান্ত)	হদ্দ
দোক্কান	দোকান
হালওয়া	হালুয়া
খারাব	খারাপ
খারজ	খরচ
খালা	খালি
খিলাল (দাঁত পরিষ্কার করা)	খিলাল
খায়াল	খেয়াল
দারছিনি	দারুচিনী
দাল্লাল	দালাল
দেহলিজ	দেওড়ী
জারুহ	জোর

আরবী	বাংলা
রাজ (মিস্ত্রী)	রাজমিস্ত্রী
রদ	রদ করা
রাফু	রিফু করা
সারকার (হাকিমের অফিস)	সরকার
আবহা	আভা
শীতা	শীত
শাকর	শিখর (গাছের শিখর)
শালাল (মিহি সেলাই)	সিলাই বা সেলাহ
ছারি (নৌকা, মাল্লা)	সারি (এর থেকে সারি গান)
সুবহ	শুভ্র
সহি (সোজা করা)	সই করা
ছাতুর (পত্র)	ছত্র (রূপান্তর ঘটেছে)
দার (গৃহ)	দ্বার (ঘরের দরজা)
ছলিব	শূল
ছনদল	চন্দন
তাক	থাক
তবল	তবলা
তাছ (গুলি বাট খেলা)	তাস (এক প্রকার খেলা)
তিলা (তৈল মালিশ)	তেল
আজিব	আজব
আরিন (দূর অর্থে)	আড়ি (কথা বন্ধ করে দূরে যাওয়া অর্থে)
আয়েশ (ভাল অবস্থা)	আয়েশ
বাদি (পরে, বিরুদ্ধে)	বাদ, বাদে
আবির (জাফরান)	আবির (রংঅর্থে)
উছরা	আশ্রয়
আতা (দান)	দাতা (যে দান করে)
আতবান	ভূষনা
আতু (হাত দ্বারা ধৃত করা)	হাত
আমার (দীর্ঘকাল বাঁচা)	অমর

আরবী	বাংলা
জাওজ	জায়া
জাহাদা (সংগ্রাম)	যুদ্ধ
উজা (মন্ত্র অর্থে)	উঝা (মন্ত্র পাঠক)
আওরা	উরু
গাবাব (গরু ইত্যাদি)	গবাদী
গাওর	গভীর
কাফুর	কর্পূর
কাদা	খাদা (মাটির বড় পাত্র)
কাদি	কাঁদা
কাজি (কর্জ আদায় করা)	কর্জ
কাছছাব	কসাই
কাবাব (ভাজাগোস্ত)	কাবাব
কাছ (নরম আওয়াজ)	কচি, কাচা
কানজ	কাঞ্চন
শাফারাত	শুপারিশ
মাশয়াল	মশাল
মুশাহারা (মাসিক)	মাসহারা
লাকিন	কিন্তু
বার'	বরং
লিফাঃ	লেহাফ
মাল (সম্পদ)	মাল
বাদীল	বদল
হিছাব	হিসাব
মাহাল (ব্যবসার দালান)	মহল
মর্মর	মর্মর
মারহাম	মলম
মাকুফ	মওকুফ
শরাব	সোরা
মাল্লা	মাল্লা
মাউত	মৃত্যু
মাইয়েত	মৃত

আরবী	বাংলা
মুনায়েম (কোমল)	মুলায়েম
সাম্পান (নৌকা)	সাম্পান
মাওরিম	মাড়ি (দাঁতের)
মাওজাজ	মোজা
মোম	মোম
মায়দা (খাদ্য)	ময়দা
নাউদ (নিদ্রার জন্য ঝুলেঝুলে নিদ পড়া, তন্দ্রা)	
নাউল (চলমান)	নালা
ওয়াহ্দাত	অদ্বিতীয়
ওয়াজন	ওজন
সিরাজ-(প্রদীপ)	সূর্য
হজম	হজম
হাউদ-(সত্যে প্রত্যাবর্তন)	সাধু-('হ' 'স' তে এবং 'স' 'হ' তে রূপান্তরিত হয়)
তুফান	তুফান

(আরবী মিফতাহুল লুগাত দেখুন)

এছাড়া আরো বহু শব্দ আছে যা বিকৃত অর্থে বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, ফাজিল, বাছুর ইত্যাদি। ফাজিল অর্থ জ্ঞানী। মূর্খ-বাচালের বেলায় রূপক ভাবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। বাছুর অর্থ, বাঘ ক্ষুদ্র গাভী-শিশু যখন বুক টান করে দৌড় দেয় তখন তাকে অনেকটা বাঘের মত মনে হয়, তাই গোবৎসকে বলা হয় বাছুর বা বাঘ।

কিছু দিন থেকে বাংলা ভাষা থেকে আরবী খেদা আন্দোলন শুরু হয়েছে। কেহ কেহ প্রচলিত বাংলা শব্দকেও পরিবর্তন করে তৎস্থলে সংস্কৃত শব্দের আমদানী করতে চান। যেমন, 'সভাপতি'স্থলে 'পুরোহিত'। এ ধরনের কুপ্রচেষ্টার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা আগেই বলেছি যে ভাষা মাত্রই পবিত্র। অতএব

কোন ভাষার প্রতিই আমাদের বিন্দুমাত্র ঘৃনা থাকা উচিত নয়। কিন্তু তাই বলে এমন একটি ভাষা যা বর্তমানে সম্পূর্ণ মৃত, অর্থাৎ অচল, তা থেকে শব্দ সংগ্রহের কি প্রয়োজন থাকতে পারে আজ পৃথিবীতে এমন কোন একজন লোকও নেই যে ব্যবহারিক জীবনে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করে থাকে। সংস্কৃতে শুধু আজ শাস্ত্র পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতএব জীবন্ত ভাষা গুলিকে বর্জন করে এই মৃত ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

যে ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশের মানুষ সহজে বুঝে সেই ভাষাই আমাদের মাতৃ ভাষা, বাংলা ভাষা। এই ভাষাকে শুদ্ধ করার জন্য অপর কোন মৃত ভাষা থেকে ধার করার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক ভাবে যে সব সংস্কৃত, পর্তুগীজ, আরবী পার্শী ইংরাজী, তুর্কী, পালি প্রভৃতি ভাষার শব্দ কালের স্রোতে প্রবেশ করে এদেশের মানুষের কাছে সহজ বোধ্য হয়ে গেছে, সেই ভাষাই আজকের প্রচলিত বাংলা ভাষা। এই ভাষাকে জোর করে পরিবর্তন করার অর্থ বাংলা ভাষা, মাতৃ ভাষার উপর চরম আঘাত হানারই নামান্তর। হজরত মসিহে মওউদ-(আঃ) তাঁর বিখ্যাত মিনানুর রহমান গ্রন্থে প্রমান করেছেন যে 'আরবীই সকল ভাষার জননী'।

ময়মনসিংহ জমাতের প্রথম সালানা জলসা

আল্লাহ্ তালার অপার অনুগ্রহে বিগত ১১-ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় ময়মনসিংহ এবং ধানী খোলা জমাতের সদস্য বৃন্দ, ঢাকা থেকে আগত বিশিষ্ট মেহমান সহ কতিপয় খোদ্দাম, বাংলার সর্ববৃহৎ জমাত সুন্দরবনের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান এবং ময়মনসিংহ শহরের বহু শিক্ষিত ও গন্যমান্য লোক যোগদান করেন। স্থানীয় জমাতের পক্ষ থেকে জলসায় যোগদান কারীদের দ্বিপ্রহরের খাওয়ায় সুব্যাবস্থা করা হয়। মসজিদের সম্মুখে সুসজ্জিত সামিয়ানার নীচে মেহমানদের বসার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। মহিলাদের জন্য নিকট বর্ত্তী একটি গৃহে বসার ব্যবস্থা করায় এবং মাইকের সুবন্দোবস্ত থাকার জলসার কার্যসূচী তাঁরা সহজেই শুনতে ও দেখতে পান। নির্দ্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ঠিক নয় ঘটিকায় কোরআন তালাওতের মাধ্যমে জলসার কাজ শুরু হয়। নজম পাঠের পর প্রেসিডেন্ট জনাব বদিউজ্জামান ভূঞা উদ্বোধনী ভাষনে এই জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এর পর জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব জকি-উদ্দীন আহ্মদ সকলকে স্বাগত জানিয়ে ভাষন প্রদান করেন। প্রথম অধিবেশনের প্রথম বক্তৃতার বিষয়-বস্তু ছিল, 'আহমদীয়া জমাত কি ও কেন। বক্তা জনাব মোঃ সলিম উল্লা এ বিষয়ে সঠিক আলোক পাত করেন। এরপর জনাব বদিউজ্জমান ভূঞা সাহেব খিলাফতের প্রয়োজনীয়তার উপর এক সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর অধ্যক্ষ আজহার আলী খান আহমদীয়া জমাত কর্তৃক ইসলাম প্রচারের এক সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন। এরপর 'ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ও ইসলামের নবজাগরণ' এই বিষয়ে জনাব আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী এক ঈমান বর্দ্ধক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি কোরআন—হাদিসের উদ্ধৃতি পেশ করে দেখান যে ইসলামের নবজাগরণ প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দীর দ্বারাই হওয়ার কথা ছিল এবং আজ তা মাহ্দীর প্রতিষ্ঠিত আহ্মদীয়া জমাত কর্তৃক যথাযথ রূপে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। তিনি মসিহে মওউদের (আঃ) বানীর আলোকে দলীল উপস্থাপিত করে দেখান যে ইসলামের বিজয় কাল অতি নিকটেই রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত ভ্রান্ত মতদাবকে বিনষ্ট করে ইসলাম সারা বিশ্বে জয়যুক্ত হবে। উক্ত প্রথম অধিবেশণের শেষ বক্তৃতা করেন সুসাহিত্যিক জণাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী কাশতকার। তিনি মহানবীর (দঃ) চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং এর আলোকে বর্তমান বিশ্বের সমস্যাবলীর পর্যালোচনা করে সকলকে ঐ মহান আদর্শ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

মধ্যাহ্ন ভোজ ও নামাজের পর বেলা আড়াইটার

কোরআন পাঠের মাধ্যমে জনাব আবুল হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু করা হয়। জনাব আখতারুজ্জমানের কবিতা পাঠের পর 'ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনীতি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন স্থানীয় কায়েদ অধ্যাপক আমীর হোসেন খান। তিনি প্রমান পেশ করে বলেন যে হালে প্রচলিত রাজনীতির সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম রাজনীতির দ্বারা নয় বরং তার আত্মিক শক্তির দ্বারাই বিশ্বে জয়লাভ করবে। বর্তমানে এই রাজনীতিই ইসলামের মুখে কলংক লেপন করেছে। দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ বি, এ, তিনি বিশ্বব্যাপী আজাবের কারণ অনুসন্ধান করে এর মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে পূর্ব থেকেই এই আজাবের প্রতিশ্রুতি ছিল, অতএব এই আযাব সম্বন্ধে প্রতিশ্রুত সাবধান কারী ও মুক্তির পথ দিশারী আল্লার প্রেরিত পুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করেই একমাত্র এই আজাব থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। তিনি এব্যাপারে কোরআন ও হাদিস থেকে দলিল পেশ করেন। এরপর খুদ্দামুল আহমদীয়ার বাংলাদেশ প্রধান জনাব খলিলুর রহমান এম, এস, সি, 'ইসলাম ও বিশ্ব-শান্তি' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন এবং অশান্তির কারণ গুলি বর্ণনা করে ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে এর সমাধান প্রদান করেন। তিনি বলেন যে এইসব অশান্তি থেকে কোন ইজমই মানব জাতিকে মুক্তি দিতে পারবে না। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে খোদার বিধান অনুযায়ী চলতে হবে। অন্যথায় মানুষ শান্তির নামে শুধু অশান্তির উপকরণই আমদানী করবে। এরপর জনাব মোস্তফা আলী সাহেব তাঁর স্বভাব সুলভ রসাত্মক ভাষায় সকলকে মানুষ হওয়ার জন্য ডাকদেন। তিনি বলেন যে বর্তমানে আমাদের দেশে সব চাইতে বেশী দুর্ভিক্ষ হল চরিত্রের দুর্ভিক্ষ। এই চরিত্রের দুর্ভিক্ষ দূর না হলে কোন দুর্ভিক্ষই দূর হবে না। তিনি সকলকে খোদা-প্রেরিত মহামানবের আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানান। সকলশেষে 'ইসলাম ও কমিউনিজম' সম্বন্ধে এক জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করে আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধরী বলেন যে, আল্লার অস্তিত্ব হল ধর্মের প্রাণ আর নাস্তিকতা হল কমিউনিজমের অবিচ্ছেদ্য অংগ। ইসলাম ইহকাল ও পর কালে মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, অপরদিকে কমিউনিজম কেবল পার্থিব জীবন নিয়েই ব্যস্ত। তিনি রাশিয়ার শাসনতন্ত্রের ১২৪ ধারা এবং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রভৃতির বক্তব্য পেশ করে দেখান যে কমিউনিজম কখনো ধর্মকে বরদাস্ত করতে পারে না, কেননা ধর্মের বিদ্যমানতায় কমিউনিজমের প্রসার সম্ভব নয়। এরপর তিনি বহু কমিউনিষ্ট নেতা ও অন্যান্য পণ্ডিতদের বানী উল্লেখ করে দেখান যে কমিউনিজম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কমিউনিজম নামে যে কাল্পনিক জীবন ব্যবস্থাটি রয়েছে তা জনৈক কমিউনিষ্ট নেতার মতে একটি প্রেতাত্মা বৈ অন্যকিছু নয়। এর পর দোয়ার মাধ্যমে এই বাবরকত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। উল্লেখ যোগ্য যে বাংলাদেশ প্রতিষ্টিত হওয়ার পর এটাই জমাতের প্রথম সালানা জলসা।

সংবাদ দাতা—
আহ্‌মদ তবশির চৌধুরী

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পুণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

*	The Holy Quran with English Translation.	T.	125·00
*	The Introduction & Comentary of the Holy Quran (5. vol.)		
*	The Philosophy of the Teachings of Islam Hazrat Ahmed (P.)	T.	2.00
*	Jesus in India ,,	T.	2.50
*	Ahmadiat—The True Islam Hazrat Mosleh Maood (R)	T.	8.00
*	Invitation to Ahmadiyat ,,	T.	8.00
*	The Life of Muhammad (P. B.) ,,	T.	8.00
*	The New World Order ,,	T.	3.00
*	The Economic Structure of Islamic Society ,,	T.	2.50
*	Islam and Communism Hazrat Mirza Basnir Ahmed (R)	T.	0.62
*	Attitude of Islam Towards Communism Moulana A.R. Dard (R)	T.	1.00
*	The Preaching of Islam Mirza Mubarak Ahmed	T.	0.50
*	কিশতিয়ে নূহ হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ	টা.	১·২৫
*	ধর্মের নামে রক্তপাত মীর্যা তাহের আহ্মদ	টা.	২.00
*	আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব মৌলবী মোহাম্মদ	টা.	১.00
*	ইসলামেই নবুয়াত ,,	টা.	0.৫০
*	ওফাতে ঈসা ,,	টা.	0.৫০

ইহা ছাড়া :—

* বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা-১।

Published & Printed by Md. F.K. Mollah at Rabin Printing & Packages

For the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacc—1.

Phone No. 283635

Editor : A.H. Muhammad Ali Anwar.

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার
৫০তম সালানা জলসা

স্থান :—৪ নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা-১

তারিখ :—৬, ৭, ও ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৩ ইং

বোজ :—শুক্র, শনি ও রবিবার।

উক্ত সম্মেলনে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব, পবিত্র কুরআনের স্থায়ী শিক্ষা ও মাহাত্ম্য, রেসালত, এবাদত, ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি, ইসলামে অর্থনীতি, বিশ্বব্যাপী আযাব ও মুক্তির, পথ, ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব, অখণ্ড মানবতা, পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে বহু আহমদী আলেম ও চিন্তাবিদগন বক্তৃতা দিবেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতী কামনা করা যাইতেছে।

চেয়ারম্যান

জলসা কমিটি

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া